শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

শুভ
শারদীয়া সংখ্যা
২০২৫

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

"জাগরণে যারে দেখিতে না পাই
থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমের আড়ালে যদি দেখা দেয়,
বাঁধিব স্বপন পাশে।
এত ভালবাসি, এত যারে চাই,
সদা মনে হয় সে যে কাছে নাই;
যেন এ আমার আকুল আবেগ,
তাহারে আনিবে ডাকি,
দিবস রজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি।"

পিতৃদেব ৺রমেন ভট্টাচার্য্য ও মাতৃদেবী ঁসুমিত্রা ভট্টাচার্য্যকে স্মরণে রেখে

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
নীলাঞ্জন, সোহিনী, অঙ্কিত ও আরভ্
মুম্বাই

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

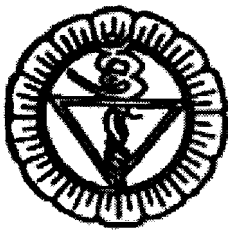

৬৪ তম বর্ষ ● শুভ শারদীয়া ১৪৩২ সন ● তৃতীয় সংখ্যা

সেক্রেটারী: শ্রী সুরজিৎ দে

সম্পাদিকা: শ্রীমতী কনিকা পাল

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এ.ই. ৪৬৭ সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

ফোন: ২৩২১-৫০৭৭/৫১২৩, মোবাইল: ৮০১৭২২৭০৯৯

E-mail: sreesreemohananandatrust@gmail.com / mohananandasamaj@gmail.com

মুদ্রণ: জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। ফোন: ৯৮৩০১৮৮৭২৪

সূচীপত্র

সতাং প্রসঙ্গ		৫৮
গীতার মর্ম	শ্রীদেবপ্রসাদ রায় (পরবর্তী অংশ)	৬১
অবনী মোহনিয়া মোহনানন্দজী (পরবর্তী অংশ)	শ্রীপিনাকী প্রসাদ ধর	৬৩
জপধ্যান (২য়)	শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক	৬৫
স্মৃতির আলোকে বিগত দিন	শ্রদ্ধেয় সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র	৬৭
MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC & WELFARE SOCIETY (LIST OF DONORS)		৬৯
দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রম সমূহের উৎসবের অনুষ্ঠান সূচী		৭০
পুণ্য-পরশ-পুলক (২০শ পর্ব)	শ্রীবসুমিত্র মজুমদার	৭২
ভ্রমণের অভিজ্ঞতা (বৈদ্যনাথ ধাম)	শ্রীমতী সোমা মুখোপাধ্যায়	৭৪
শ্রীশ্রীদুর্গাশক্তি	শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল	৭৬
শিবাণী পীঠ	শ্রীমতীরীণা মুখোপাধ্যায়	৭৮
সপ্তমী (কবিতা)	শ্রীমতী অরুণিমা বসুমল্লিক	৭৯
শ্রীশ্রীবালানন্দের ঈশ্বরী শ্রীশ্রীবালেশ্বরী মা	শ্রীসোমনাথ সরকার	৮০
সর্ব সাধনার সার কথা	শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায়	৮২
এস মাগো (পুনর্মুদ্রিত) (কবিতা)	শ্রীফকির চন্দ্র শুকুল	৮৪
মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী রূপ (সম্পাদকীয়)		৮৫

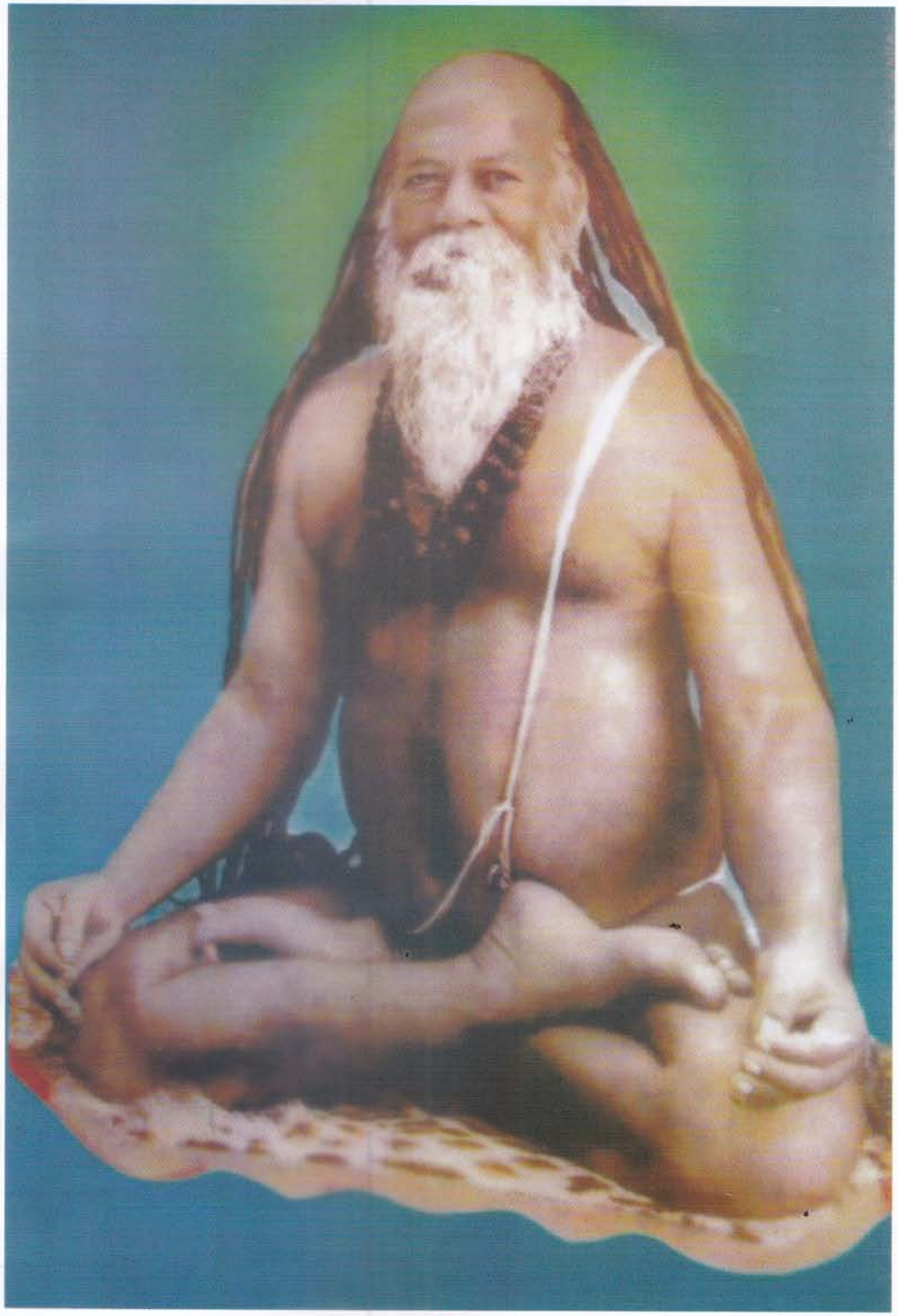

পরম শুভানুধ্যায়ী জনৈকা শিষ্যা

সতাং প্রসঙ্গ

প্রবোধনী

পরম শুভানুধ্যায়ী শ্রীশ্রী ৺গুরুচরণাশ্রিত সেবক— শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী
পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ।

পৌরাণিক বিবরণীঃ—সদাশিবের নিকট প্রাপ্তবর দুর্দণ্ডপ্রতাপ রক্ষোকুলপতি রাবণের বিরুদ্ধে সংগ্রামযাত্রার পার্শ্বে ভগবদাবতার শ্রীরামচন্দ্র সংহত্রীবরদায়িনীশক্তি শ্রীদুর্গার অকাল-বোধন করিয়াছিলেন। চৈত্রবংশসমুদ্ভব ক্ষিত্যাধিপতি কোলাবিধ্বংসী ভূপতিগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে হৃতরাজ্য হইয়া রাজ্যপ্রাপ্তি কামনায় এবং ধন লোভে অসাধু পুত্র দারা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত একদা বিপুল ধনসম্পদাধিকারী বৈশ্য ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষদাত্রী বিশ্বশক্তির কঠিন তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিয়া প্রবোধন করিয়াছিলেন: শ্রীরামচন্দ্র জগন্মাতাকে তিন দিন মর্ত্ত্যধামে রাখিয়া অতিশয় নিষ্ঠার সহিত ও এমন কি প্রতিশ্রুত অষ্টোত্তরশত নীলকমলদল এক সংখ্যালঘু হওয়ায় নিজ অক্ষিকমল উৎপাটন—তৎপর হইয়া জগন্মাতাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। ...অতঃপর চতুর্থ দিনে নিজ বিজয় যাত্রা বিশ্বশক্তি বরপুষ্ট হইয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মহারাজ সুরথ ও বৈশ্য সাহা নিজ দেহ অস্থিমজ্জাবসান্তর্গত শোণিতসিক্ত বলি প্রদান করিয়া জগন্মাতার বরপ্রভাবে যথাক্রমে হৃতরাজ্য ও বৈশ্য প্রার্থিত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। দৈনন্দিন ক্রিয়াসাধনায় বৈদিক গায়ত্রী দ্বারা ব্যষ্টি ধীশক্তির মধ্যে সমষ্টি সবিতৃপ্রকাশময়ী বিশ্ব-শক্তির প্রবোধন করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। দেহপিণ্ডে আধারগতা প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তির প্রবোধন দ্বারা সহস্রারে অখণ্ডজ্ঞানশক্তির প্রবোধন ব্যতিরেকে শিব শবতুল্য চৈতন্য অব্যাকৃত, অস্ফুরিত... তাই শক্তিই নিস্পন্দশবতুল্য শিবাধারে... চৈতন্যাধারে অখণ্ডকালের বক্ষে স্পন্দনময়ী নর্ত্তনশীলা কালী... "শিবঃ শক্ত্যাযুক্তো প্রভবতি শক্য প্রভাবিতুং"।

সর্ব্বভূত আত্মা কালী, সর্ব্বভূত শক্তি কালী
সর্ব্বভূতে পূর্ণরূপে কালী দ্বৈতহীন।
সর্ব্বভূতে তুল্য তাঁর নাহি কিছু অন্য আর
দিব্যোন্মাদে এই তত্ত্ব স্ফুরে নিশিদিন।

শক্তিই বিশ্বপ্রসবিনী, বিশ্বপালয়ত্রী, বিশ্বসংহত্রী... মহাকালী মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী সত্ত্ব রজঃ তমো গুণত্রয়ের ঘনীভূত তত্ত্ব— এই শক্তি অবস্থাতে মূলতত্ত্ব অর্দ্ধনারীশ্বর সাকার উপাসনায় বিবিধ দেবদেবীরূপে কল্পিত, বেদান্তের মায়া সাংখ্যের প্রকৃতি পাতঞ্জলের চিতিশক্তি, রামানুজের অচিন্ত্যশক্তি, অন্যান্য আচার্য্যগণের চিৎশক্তি, অচিৎশক্তি, পাশ্চাত্যজ্ঞানবাদে Primordial Energy, তন্ত্রে ইনিই সচিদানন্দ বিভবাশক্তি।

সচিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ
আসীচ্ছক্তিস্ততোনাদঃ নাদাদবিন্দুসমুদ্ভবঃ।।

'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরচরম্' 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়রা' 'মমযোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম','মম মায়া দুরত্যয়া' ইত্যাদি।

ধর্মে'র তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্যই হইল জড়ের মধ্যে নিমজ্জিত বিশ্বশক্তির প্রবোধন। হিন্দুধর্ম বস্তুর তত্ত্ব বিশ্লেষণ নহে, philosophic discussion মাত্র নহে, ভয়ে, নৈরাশ্যে, চমৎকারিতামুগ্ধতায়, প্রতায় বা বিপত্তি নিবৃত্তির জন্য অলৌকিক শক্তির কাল্পনিক পৌত্তলিকতায় আত্মনিবেদন মাত্র নহে, প্রত্যুত হিন্দু ধর্ম আচরণীয় (philosophic adaptation in life)। আচরণে ও চিন্তায় প্রতিক্ষণীয় জীবন চলার পথে আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন... যে ধর্ম জীবনে পরিবর্ত্তন আনে না সেইরূপ আলোচনীয়মাত্র ধর্ম কালের গতিতে রূপান্তরিত হইয়া যায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যে আত্মানুশীলন ও ভজন মানুষের সংস্কার পর্যন্ত প্রসর্পিত হয় তাহা সনাতন— "এষঃ ধর্ম্ম সনাতনঃ"। ধর্মই হইল সেতু যাহার দ্বারা জীবশক্তির সহিত বিশ্বশক্তির সংযোগ স্থাপন হইতে পারে। প্রাণ, প্রেম ও প্রজ্ঞা এই তিন ত্রিবেণী সঙ্গমেই সত্ত- শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি।

'প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্বং'— চিত্তের স্বাভাবিক স্বরূপই হইল প্রজ্ঞা—যখন রজঃ ও তমঃ দ্বারা এই প্রজ্ঞা আবৃত হয় তখনই জীব বহির্মুখপরায়ণ হইয়া বিশ্বভোগের জন্য জনম মরণ সংকুল সংসার আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতে থাকে—আবার যখন সত্ত্বাভিমুখী গতি লাভ করে তখন হইতেই তাহার মধ্যে অসুর দানববৃত্তি পরাভূত হইয়া দেববৃত্তির আবির্ভাব হয়। এই দেবাসুর-সংগ্রাম পশুভাবাপন্ন মানব মহিষাসুরের সঙ্গে সমস্ত "দেবানাং তেজরাশি সমুদ্ভাম্" মহিষাসুরমর্দ্দিনী চণ্ডীদেবীর সংগ্রাম— অনাদিকাল হইতে যাবৎ বিমুক্তি পর্য্যন্ত প্রতি জীবে প্রতি সৃষ্ট পদার্থে অনুক্ষণ চলিতেছে।

বাসনা কামনাই রক্তবীজ অসুর শম্ভু নিশুম্ভ রাগ ও দ্বেষ এবং চণ্ড ও মুণ্ড লোভ আর মোহ। বাসনা ও কামনার বীজ বা ভোগসংস্কার ঐকান্তিকভাবে নিবৃত্তি না হইলে অমৃত-ময়ী প্রাণ ও প্রজ্ঞাময়ী মাতৃচরণে স্থিতিলাভ করা যায় না। সমস্ত বাসনা কামনা যেদিন মাতৃচরণে সমর্পণ করিতে পারা যাইবে, জীবত্বের প্রাণ, বাসনা শোণিতবিন্দু পান করিতে করিতে তাহা নিঃশেষ করিয়া দিবেন— সেই দিনই ততঃ প্রসন্নমখিলং, হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি জগৎ স্বাস্থ্য- মতীবাপ নির্ম্মলাঞ্চাভবন্নভঃ'— সমগ্র বিশ্বও তখন নির্ম্মল পবিত্র, মনোরম, মঙ্গলাস্পদ হইয়া উঠিবে।

চামুণ্ডা জগন্মাতা সত্যই কি নৃশংসা পাষাণী, ঘাতিনী— নিজসৃষ্ট সন্তানদের কেবলই ধ্বংস করিতেছেন?... না, তিনি 'চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্ট্যা' অন্তরে কৃপা বাহিরে সমরনিষ্ঠুরতা তাঁর। মহাসরস্বতীরূপে তিনি—

'সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে,
স্বর্গাপবর্গ দে দেবী নারায়ণী।'

মহাকালীরূপে তিনিই...

"কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িণী
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণী"।

মহালক্ষ্মীরূপে তিনিই...

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী"!

তিনিই সনাতনী শক্তিভূতা, গুণাশ্রয় ও গুণময়ী আমরা তাঁরই অমৃতময় ক্রোড়ে নিত্য লালিতপালিত সম্বর্দ্ধিত আবার তাঁরই ক্রোড়ে মৃত্যুশয়নে শায়িত।

জীবদেহে তিনটি স্তর রহিয়াছে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই তিন স্তরেই সংস্কারের গ্রন্থিবন্ধন হইয়া রহিয়াছে...এই গ্রন্থি বিমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সংস্কার বিমুক্তি নাই। ব্রহ্মগ্রন্থি, রুদ্রগ্রন্থি ও শিবগ্রন্থিরূপে আবরণের অন্তরালে সত্যস্বরূপা, চিন্ময়ী, বিশ্বশক্তি 'স্বপ্রভাপ্রোজ্জলাং' রূপে স্বতঃস্ফূর্ত রহিয়াছেন.... মানুষের শেষ গ্রন্থি 'অহং। তাই দুর্দ্দমনীয় দূরপনেয় "হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং"।

তপঃপুত মহাসাধক তাপস কৈলাসাধিপতি পার্ষদ রাবণও এই অলঙ্কার গ্রন্থি মুক্ত হইতে না পারিয়া দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। অমিতবলাক্রান্ত হওয়ায় তার সত্ত্ববৃত্তি রজভিমুখী গতি লাভ ক'রে যখন দেবতা নিগ্রহকারী রাক্ষসরূপে পরিণত হইল, তমোবৃত্তির অনুশীলন ফলে বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানা নিষ্কল্মষা জনকদুহিতা বিশ্বশক্তিকেও অবমাননা করিল তখন স্বয়ং বিষ্ণু অবতার শ্রীরামচন্দ্রও শক্তির প্রবোধন ব্যতীত তাঁকে সংহার করিতে অসমর্থ হইলেন।

নিত্য শিবাধিষ্ঠান বিল্ববৃক্ষতলে আসীন হইয়া অর্দ্ধনারীশ্বররূপে প্রকটিত একবৃন্তে দুটি বিল্বফলের মধ্যে শিবশক্তির অখণ্ড চৈতন্যময়ী শক্তিকে প্রবোধন করতঃ রাবণ জয় ও আদ্যাশক্তি সীতাকে নিরাবরণ করিবার জন্য তিন দিন ব্যাপী মহাসমারোহে আরাধনা করিয়া অবশেষে বিশ্বমাতা দুর্গতিহারিণী দুর্গার বরপ্রবাহে বিজয়যাত্রা সম্পন্ন করিলেন ও প্রতীক রাখিয়া দিলেন অপরাজিতা নির্ম্মাল্য ও শান্তিকলসের সাক্ষী যবাঙ্কুর। সৌরকেন্দ্রে পৃথিবীর পরিভ্রমণের অর্দ্ধসন্ধিস্থলে, মহাষ্টমী ও মহানবমীর মহাসন্ধিপূজায় জগন্মাতা কালীকরাল-বদনা বিনিষ্ক্রান্তা সিপাসিনী রূপে যেমন আবির্ভূর্তত হইয়াছিলেন সঙ্গে সঙ্গে—

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রাবি তামসি
নিয়তে! ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণী নমোহস্তুতে"।

সুতরাং একই স্বরূপের মধ্যে 'দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরমালাবিভূষণে চামুণ্ডা ও সৌমেভ্যস্তুতিসুন্দরী রূপে' আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। সমাবেত দেববৃন্দ ঋষিবৃন্দ সেই মহামাহেন্দ্রক্ষণে সাক্ষাৎ প্রকটীভূতা শ্রীরামচন্দ্র আরাধিতা বিশ্বশক্তির চরণে শেষে স্তুতি শ্লোক দ্বারা যেমন প্রার্থনা করিয়াছিলেন আমরাও সেই বিশ্বমাতাকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা জানাই।

দেবী! প্রসীদ পরিপালয় নোহরিভীতে
নিতং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাংশ্চ শমং নয়াশু
উৎপাত পাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান!
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বংদেবী বিশ্বার্ত্তিহারিণী!
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে! লোকানাং বরদা ভব।।

হে দেবী, প্রসন্ন হও; যেমন অসুর বধ করিয়া দেবগণকে রক্ষা করিলে সেইরূপ শত্রুভয় হইতে

—এরপর ৬৬ পাতায়

গীতার মর্ম
শ্রীদেবপ্রসাদ রায় (পরবর্তী অংশ)
শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।। ২/১১

গতাসূন্ মৃত। অগতাসূন্ চ ও জীবিতদের জন্য।

ভগবান কহিলেন, হে অর্জুন! যাদের জন্য শোক করবার প্রয়োজন নেই তুমি তাদের জন্য শোক করে অবিবেকের ন্যায় কার্য করছ। তুমি কথা বলছ পণ্ডিতের মত, কিন্তু বস্তুতঃ তোমাকে পণ্ডিত বলে বোধ হচ্ছে না। কেননা, পণ্ডিতেরা মৃত বা জীবিত— কারও জন্য শোক প্রকাশ করেন না।

ব্যাখ্যা— সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান সমস্ত জীব। সকলের জীবনই দুঃখভরা। যা চাইনা, তাই আসে, যা চাই, তা পাইনা। 'যাহা চাই, তাহা ভুল করে চাই/ যাহা পাই তাহা চাইনা' যদিবা কিছু পাই তা একটা আদরের বস্তু বলি দিয়ে। যখন একটি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেতে গিয়ে আর একটি আকাঙ্ক্ষিত ধন হারাতে হয়, তখন দুঃখের উদয় হয়।

সুখ বলে যাহা চাই, সুখ তাহা নয়।
কি যে চাই জানিনা আপনি।
আঁধারে জ্বলিছে ওই ভুজঙ্গের মণি, ওরে কোরো ভয়।

সত্য রাখতে হলে অযোধ্যা ছাড়তে হয়, রাজাদর্শে অটল থাকতে গেলে পত্নীকে বনবাসে পাঠাতে হয়। অভিজ্ঞতা অর্জন করতে গেলে যৌবন চলে যায়। এইরূপ ছোট বড় দুঃখময় ঘটনা আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই অগণিত। যে যত বড় মানুষ, যার কর্মের পরিধি যত বড়, তার দ্বন্দ্ব সংঘাতের ভূমি তত প্রকাণ্ড, তার বেদনা এত গভীর ও নির্মম, তার দুঃখ তত বেশী।

আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই এই দুঃখ। এই দুঃখ নেই এক পুরুষের আর প্রস্তরখণ্ডের। যা পূর্ণচেতন আর যা পূর্ণ অচেতন। এই দুই প্রান্ত মধ্যে যারা আছে, তাদের সকলেরই দুঃখ আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিষাদ যোগে আমরা দেখতে পাই। দুইটি আদর্শের সংঘাতে অর্জুন বিষণ্ণ। একটি আদর্শ এসেছে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য হতে। আর একটি এসেছে পারিবারিক প্রীতি হতে। Political Ideal বলে যুদ্ধ কর। Domestic Ideal বলে, যুদ্ধ কোরোনা। রাষ্ট্রনীতি বলে দুর্বৃত্ত আততায়ীকে বধ কর। পারিবারিক নীতি বলে, প্রিয়জনদের রক্তে হস্ত কলুষিত কোরোনা।

দুই বিরোধী নীতির আঘাতে অর্জুন বিষাদযুক্ত হয়ে ভেঙে পরেছেন। এমন অবস্থায় সকলেই ভেঙে পড়ে। মানুষ মাত্রেরই দুঃখের উদয় এই আদর্শের সংঘাতে। এই প্রকার অবস্থায় পতিত মানুষের শান্তিলাভের

পন্থাই শ্রীশ্রীগীতায় উপদিষ্ট হয়েছে। গীতার আঠারোটি অধ্যায় যেন আঠারোটি সিঁড়ি। প্রথমটি বিষাদ যোগ, শেষটি মোক্ষযোগ। বিষণ্ণ অর্জুনকে একটির পর আর একটি সিঁড়িতে ধাপে ধাপে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শেষ ধাপে একেবারে মুক্তির রাজ্যে পৌঁছে দেওয়া। এই মুক্তি শুধু মৃত্যুর পরবর্তী কোন অবস্থা বিশেষ নহে। জীবন্ত অবস্থাতেই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই অসংখ্য বন্ধন মাঝেই দ্বন্দ্বময় বিষাদভূমি হতে দ্বন্দ্বাতীত শান্তির ভূমিতে উন্নয়নই গীতার মোক্ষ। জীবন্মুক্তিই গীতার মূল লক্ষ্য।

অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার

তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত নানাবর্ণ গন্ধময়। প্রদীপের মত সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায় জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমার শিখায়— তোমার মন্দির মাঝে।

শ্রীগীতায় যত কথা বলা হয়েছে, তার মূল, তার বীজ রয়েছে শ্রীভগবানের প্রথম উক্তিটির ভিতর। 'অশোচ্যানন্ব শোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে'। আর পরম রহস্যময় এই গীতা শাস্ত্রের সকল রহস্যের উন্মোচন হয়েছে, "সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"

এই চরম মন্ত্রের মধ্যে "অশোচ্যানন্ব শোচস্ত্বং" বলে তিনি মুখ খুলেছেন, আর 'মাশুচঃ' বলে তিনি থেমেছেন। উপক্রমে (শুরুতে)ও উপসংহারে (শেষে) একই শুচ্ ধাতুর প্রয়োগ।

অর্জুনের কথাগুলি জ্ঞানীর মত কিন্তু তার কার্য্য তদ্বিপরীত। অর্জুন শ্রেয়স্কামী। তাঁর কাম্য বস্তু শ্রেয়ঃই। 'ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি' (১/৩১) বা 'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে' (২/৭) এইসব কথা তাঁর মুখ থেকে আমরা শুনেছি, তিনি যে শ্রেয়ঃই অনুসন্ধান করছেন। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি তা করেন না।

যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধ না-করা এই দুইটি পক্ষ। সংশয়ের এই দুইটি সীমান্ত। এই দুইটি সীমান্তের মধ্যে অর্জুনের চিত্ত দোল খাচ্ছে। সংশয়ের লক্ষণই এই দুটি প্রান্তে মন দুলতে থাকে। সংশয় ছেদনের ভাব অর্জুন গোবিন্দের উপর দিয়েছেন। দিয়ে আবার ন যোৎস্য বলে একটি পক্ষকে ধরতে চাইছেন। ভগবান শ্রীগোবিন্দ কী উত্তর করেন, তা শোনবার জন্য অর্জুনের সঙ্গে আমরাও উৎকর্ণ। উত্তর এল— 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।'

ভগবান বললেন, অর্জুন, তোমার দুটি চিন্তাই অশোচ্য, দুটি alternative ই দোষযুক্ত। 'যুদ্ধ করা' আর 'যুদ্ধ না করা', তোমার দুটি পক্ষই সমভাবে নিন্দনীয়। যুদ্ধ করলে লোক মরবে, যুদ্ধ না করলে আত্মীয় বাঁচবে। এইতো তোমার কথা, কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে হত কি জীবিত, কেউই অনুশোচনার বিষয় নহে।

ক্রমশঃ

অমৃতবাণী

স্বার্থপরতার দিকে গিয়া স্বাধীনতা হারাইবে। অগ্নিতে যত ঘৃতাহুতি দিবে ততই প্রজ্জ্বলিত হইবে। জগতের ক্ষুধা যতই মিটাইতে যাইবে, ততই বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু অন্তরের ক্ষুধা যতই মিটাইতে থাকিবে, ততই মিটিবে।

অবনী মোহনিয়া মোহনানন্দজী (পরবর্তী অংশ)

শ্রীপিনাকী প্রসাদ ধর

মীরাশী পরিবারের অনেকেই কলকাতায় আসতেন মাঝে মধ্যে। কলকাতায় তাঁদের অনেক আত্মীয় স্বজনরা ছিলেন— সেখানে মাঝে মধ্যে মহারাজজীর অবস্থানকালে আমারও তাঁর কীর্তন শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। সৎসঙ্গের আলাপচারিতায় এসেছিল মুগ্ধতা। তাঁর দিব্য উপস্থিতি যেন চৈতন্যদেবেরই অনুরূপ; আবহ স্পন্দিত পরম আধ্যাত্মিকতায়। হয়তো কলকাতাতেই দীক্ষিত হয়েছিলেন মীরাশীশিলং এর ভক্তজন। অমিয়দর্শন-মহারাজজী সবে মধ্যবয়সের চৌকাঠে পা রেখেছেন সেই পঞ্চাশের দশকে। তিনদিনের বেশি কোথাও না থাকার সংকল্প তখনো দানা বাঁধেনি। তবে রমতা সাধু-তাই বহতা নদীর মতোই অবাধ গতি একস্থান থেকে আরেক স্থানে, এক শহর থেকে অন্য শহরে এমনকী দেশ থেকে দেশান্তরে।

শুরুর দিনগুলোতে শিলং শৈল শহরে এলে মীরাশীতেই অবস্থান করতেন তিনি। অন্তত মাসখানেক কাল দেব গীতালি, কীর্তন, নিত্যকার পুজো সব মিলিয়ে ভক্তির সুধাসাগরে ডুবে থাকতেন শিলং এর ভক্তমণ্ডলী। সংখ্যায় তখনো খুব বেশি ছিলেন না তাঁরা। সুধীজনের কথোপকথনে ছড়িয়ে পড়তো মোহন বার্তা-এক সন্ন্যাসী এসেছেন মীরাশীতে। কী সুন্দর যে দেখতে; 'সুন্দর গৌরাঙ্গ রায়'। তার উপর কীর্তন? শুনলে বুকটা জুড়িয়ে যায়। কী মিষ্টি আর ভক্তিভাবে ভরপুর!

মহারাজজীর কীর্তনের একটি বিশেষ ধরণ ছিল: একটি গানে কোনও একটি বিষয় বা প্রশ্ন তুলে পরের গানে যেন তারই উত্তর বা সমাধান খুঁজতেন তিনি। তাঁর দর্শনে, শ্রবণে যথার্থ মোহন আনন্দ, ত্রিতাপ জ্বালার ক্ষণিক অবসান হত সংসারী ভক্ত-শিষ্য সমাজের। অনেকেই তাঁর মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের রূপ দেখতে পান। রাস্তা দিয়ে যখন তিনি যেতেন খাসিয়া নারী পুরুষ বলতেন 'He is indeed, very much like christ!' কিন্তু সবকিছুরই একটি বিপরীত দিকও চোখে পড়ে কারো কারো, যাঁরা বলতেন 'চুপ করো অবিশ্বাসী কথা কয়োনা' বললেও কী তাঁরা থামেন?

শিলং এ তখন আদিবাসী নন এমন অনেকের বসবাস। বেশিরভাগ বাঙালী পরিবার, কিছু বা অবাঙালী। অধিকাংশ পরিবারের কর্তা ব্যক্তিরা উচ্চপদস্থ আমলা বা রাজ কর্মচারী। কিছুদিন হল সন্ধ্যাবেলা চা জল খাবারের অবসরে গিন্নীদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন এঁদের অনেকেই। ব্যাপারখানা কী? খোঁজ নিয়ে জানলেন, অল্পবয়সী এক ভুঁইফোড় সন্ন্যাসী নাকি কলকাতা থেকে এসে মীরাশীতে গেড়ে বসেছেন কিছুদিন ধ'রে। দেখতে নাকি ময়ূর ছাড়া কার্তিকটি, কীর্তনের গলা দুর্দান্ত। এসবের আকর্ষণেই গিন্নিরা রোজ বিকেলে জড়ো হচ্ছেন মীরাশী ভবনে। একদিন নয়, দু'দিন নয়, যখন দিনের পর দিন এই কাণ্ড চলতে থাকলো; স্বামীদেবতাদের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। কী হচ্ছে কী এসব? ভণ্ড সাধুদের কীর্তিকাহিনীর কথা অনেক শুনেছেন তাঁরা— এবার কী তাহলে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা? এই সমস্ত গোল মেলে লোক একেবারে হ্যামলীনের সেই বাঁশিবাজিয়ের মতো। সেই মায়ায় ঘর ছেড়েছে যে কতো

বিহ্বলা! উত্তেজিত হয়ে উঠলেন পুরুষ বর্গ: 'এসব হচ্ছেটা কী brother?' হ্যাঁ দ্যাখোতো কী উৎপাত!' শেষে ঠিক করলেন তাঁরা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখবেন পুরো ব্যাপারটা। শিলং এ অনেক প্রতিপত্তি তাঁদের, দরকার মত ব্যবস্থা নিতে কোনও অসুবিধা হবে না।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে কোনো এক সন্ধ্যায় বড় রাস্তার কাছাকাছিই মীরশীধামের একটি প্রশস্ত হলঘরে মহারাজজী কীর্তনে রত, অভিভূত ভক্তবৃন্দ দোহার দিচ্ছেন, মেঝেতে ফরাসপাতা। সামনের দিকে বসে আছেন মহিলারা। পিছনে পুরুষ ভক্তদের সমাবেশ। মহারাজ একটি ছোট মঞ্চের উপর মন্দিরা হাতে দণ্ডায়মান। তাঁর ঠিক পাশটিতে একটি সামান্য উঁচু আসনে শ্রীমৎ বালানন্দজীর প্রতিকৃতি, ধূপ ধুনো ফুল মালায় সুশোভিত। এসব কিছুর মধ্যে কেমন যেন বেমানান লাগছে কিছু উপস্থিতি। হলঘরের মধ্যে নয়— ঠিক তার বাইরে একটা রেলিংঘেরা বারান্দায় সিগারেট, চুরুটের ধোঁয়ায় ধোঁয়াশা করে দাঁড়িয়ে আছেন কিছু মানুষজন, যাঁদের পরণে উইরোপীয় পোষাক। ছোট্ট দলটির নেতা অবশ্যই অবনীমোহন— তাঁর সঙ্গে রয়েছেন উপেন রায়, মনোরঞ্জন চৌধুরী, শৈলেনবাবু এবং আরও কয়েকজন। নানা মন্তব্যের মাঝখানে সন্ন্যাসীর প্রতিটি পদক্ষেপের উপর সবাই তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন। এরই মধ্যে উপেনবাবু হঠাৎই বলে উঠলেন, "আচ্ছা brother, ওনাকে কেমন চেনা চেনা বলে মনে হচ্ছে; ভালো করে তাকিয়ে দেখোতো কোথায় যেন মনে হয় দেখেছি দেখেছি?" খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সন্ন্যাসীর সুন্দর মুখটা দেখতে লাগলেন অবনীমোহন। অনেকগুলো বছরের ধূসর পর্দা একটি একটি করে সরে গেল যেন সেই প্রশান্তি নিলয় থেকে। তিনি উপেনকে বলাতে উত্তর পেলেন, "তুমি ঠিকই বলেছ, একদম ঠিক! এতো সেই ছেলেটি হে,— হোস্টেলের দরজা বন্ধ করে কেবল পুজো করতো, কারও সঙ্গে একটুও মিশতো না... তারপর একদিন উধাও। Just vanished in to the thin air. My goodness, এতবছর পর...।' গলাটা হঠাৎ কেমন যেন বুজে এলো অবনীমোহনের। আনমনা মানুষটা হঠাৎ যেন চুপ; কিছুই যেন আর কানে আসছে না। এদিকে নানা জনের নানা মন্তব্যের ফাঁকে বেফাঁশ কিছু বলে বসলেন বুঝি উপেন রায়— মুখে বাঁকা হাসি নিয়ে তাকালেন সন্ন্যাসীর দিকে। একী! কীর্তন করতে করতে তার মধ্যেই কেমন যেন এক দৃষ্টিতে তাঁরই দিকে তাকিয়ে রয়েছেন মহারাজজী। মর্মভেদী সেই দৃষ্টি। যেন মুখের দিকে নয়— মানুষটার ভেতরটা দেখছেন সাধু। বুকের ভিতরে প্রচণ্ড হাতুড়ির বাড়ি পড়লো যেন তারপর। টলমলে পায়ে শিগগির বারান্দার রেলিং ধরে বসে পড়লেন একেবারে মেঝেতে। সন্ন্যাসী তখন গাইছেন: "সংসারে তুমি রাখিলে আমারে যে ঘরে..."।

ক্রমশঃ

জপধ্যান (২য়)

শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক

এবার ধ্যানের কথা লিখতে গিয়ে দেখলাম, "শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে'—। এতজন এতভাবে ধ্যানের আলোচনা করেছেন, তা সব জানাতে হলে একটা বড় সড় বই-ই লেখা হয়ে যায়। যাইহোক আমি এখানে খালি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রী শ্রী ঈশাত্মানন্দজী (শিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটির মিনিস্টার ইনচার্জ) বর্ণিত ধ্যানের কথাই বলব— যদিও ঠিকভাবে বলতে পারব কিনা জানিনা। আমার স্বল্প বুদ্ধিতে যা বুঝেছি সেটাই জানাচ্ছি। শ্রীশ্রীগুরুমহারজজীর নির্দেশিত ধ্যান প্রসঙ্গ এর আগের সংখ্যাতে লিখেছি।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে সাতচল্লিশটি শ্লোকের মাধ্যমে ধ্যানযোগের কথা বলা হয়েছে। পড়তে গিয়ে দেখলাম এখানে বিশেষ করে যোগীদের ধ্যানের বিষয়েই বলা হয়েছে। "যোগিভিঃ ধ্যানগম্যং"— যোগী ধ্যান আরম্ভ করার আগে নিজেকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করবেন। একাকী নির্জনস্থানে দেহ ও মন সংযত করে তিনি সমাহিত হবেন; সেই নির্জন স্থানটি কেমন হবে? তা হবে শুচি, সমতল প্রদেশ, খুব উঁচুও না নীচুও না। সেখানে যোগী কুশাসন, অহিন অর্থাৎ হরিণচর্মের আসন বিছিয়ে তার ওপর বসবেন—

নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতি নীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ (গীতা ৬.১১) ঘাড় ও মাথা সোজা একই রেখাতে রেখে নিশ্চল এবং স্থির হয়ে, অন্য কোনদিকে না তাকিয়ে নিজের নাকের ডগাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং মন সংযত করে একভাবে ধ্যান অভ্যাস করবেন।

"সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ"— (গীতা৬.১৩) আমাদের মত সাধারণ লোকের হয়তো এভাবে ধ্যান করা সম্ভব নয়, তাই এবার শিকাগোর স্বামী ঈশাত্মানন্দজীর বর্ণিত সহজ ধ্যানের কথা বলি। এর আগে দেখি সঙ্ঘমাতা শ্রীশ্রীসারদাদেবী জপধ্যান সম্বন্ধে কী বলছেন, 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' বইটির তৃতীয় খণ্ডে লেখক লিখছেন, "একজন খুব ছটফটে —মা তাকে একটু স্থির হয়ে ধ্যান-জপ করতে বলেন, সে বলে, "মা, মন বসেনা তো কি করবো?" মা বললেন ধ্যান না হয় কঠিন, আমরা মেয়েমানুষ জপেতেই আমাদের সব হয়, নয় তোমরা তাই কর। একটু স্থির হয়ে বসে জপ করতে হবে। "দশ বিশ হাজার জপ রোজ করে দেখো কেমন মন আপনি নুইয়ে না আসে, তখন বোলো সাধু সন্ন্যাসী ছাড়া ধ্যান হওয়া বড় কঠিন।"

মাতৃস্মৃতি সুধা শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে ৩য় খণ্ড পৃ ৫৪২। আবার ফিরে আসি শ্রীশ্রীঈশাত্মানন্দজীর কথায় যিনি সহজ ধ্যানের পথটি দেখিয়েছেন। ঠাকুর ঘরে বা নির্জনস্থানে পদ্মাসনে অথবা সুখাসনে মনটি সমাহিত করে বসতে হবে। এবার মুখ দিয়ে ওঁকার ধ্বনি করে শরীরে বায়ু প্রবেশ করিয়ে তা শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে মনে মনে ভাবতে হবে দেহের সকল দূষিত বায়ু নাসিকা দিয়ে বেরিয়ে গেল। এভাবে কয়েকবার করে মন ও শরীর ধ্যানের জন্য প্রস্তুত হল। এবার চোখবুজে একমন হয়ে কল্পনা করব আমাদের হৃদয়মাঝে একটি অপরূপ শতদল পদ্ম ফুটে আছে— তার রংটি লাল। এখন আমি আমার গুরু বা ইষ্টদেবতার কথা ভাববো। ভাববো ঐ পদ্মে আমার ইষ্টদেবতা এসে বসবেন। ধীরে ধীরে একটি

উজ্জ্বল আলো ফুটে উঠলো, তার ভেতর দিয়ে আমার ইষ্টদেবতা সেই হৃৎকমলে অধিষ্ঠান করলেন, চোখ দুটি করুণায় ভরা মুখে স্মিত হাসি, সুন্দর দুটি চোখে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললাম, "প্রভু আমাকে একটু তোমার সেবা করতে দাও"। এবার একটি মালা তাঁর চরণতলে রেখে একটু একটু করে জল দিয়ে ভাল করে চরণদুটি ধুইয়ে দিচ্ছি। স্পর্শ করতে পারছি, সেই বিষ্ণুচরণ কী সুন্দর কী মোলায়েম। এরপর সেই চরণদুটির ওপর একটু করে লাল চন্দনের ফোঁটা ও তার চারধার ঘিরে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজালাম। কী অপরূপ শোভা। তার ওপর কয়েকটি ফুল রাখলাম। উনি যেন একটু নত হয়ে দেখছেন আমি কী করছি। নিশ্চল হয়ে উনি বসে আছেন। আমি তাঁর হাত মুখ সবই দেখতে পাচ্ছি। এবার একটি থালায় তাঁর প্রিয় কোন ফল বা মিষ্টি এনে ধরলাম। তিনি একটু ফল বা মিষ্টি মুখে দিলেন। আমি একটি বাটি করে জল এনে হাতটি ধুইয়ে শুকনো কাপড়ে মুছিয়ে দিয়ে একটি প্রদীপ জ্বালালাম, ধূপ জ্বাললাম, একটি সুন্দর মালা তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়ে হাতেও দুটি ফুল দিলাম। তিনি ফুলদুটি নেড়ে চেড়ে দেখছেন। এবার তাঁর কোলে মাথা রেখে বললাম, "আমাকে তুমি মুক্ত করে দাও প্রভু আর আমি এ জগতে থাকতে চাই না।" ঠাকুর চুপ করে বসে আছেন, আমিও তাঁর সামনে চুপ করে বসে থাকলাম। আর কিছু নেই ভগবান আর আমি, আমি আর ভগবান। ধীরে ধীরে তিনি একটি উজ্জ্বল জ্যোতিতে পরিণত হয়ে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করলেন। আর কিছু নেই শুধু আলো, সেই আলোতে আলোকিত হয়ে আছি আমি, আর কোথাও কিছু নেই; আমি সেই জ্যোতি স্বরূপ, আমি সেই জ্যোতিস্বরূপ— আমি সেই জ্যোতিস্বরূপ।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

জগতে সবাই আনন্দে সুস্থভাবে থাকুন।

জয়গুরু

---

৬০ পাতার পরবর্তী অংশ

সতাং প্রসঙ্গ

আমাদের রক্ষা কর। সমুদয় জগতের কারণীভূত পাপসকল এবং অধর্ম্মের পরিণতিজাত প্রচণ্ড উপসর্গ নিচয়দূর কর; হে জগদুঃখহরে দেবী, তুমি বোধন প্রবুদ্ধা হইয়া প্রণতগণের প্রতি প্রসন্না হও; হে ত্রিলোকবন্দ্যে! তুমি বিশ্বজনের কল্যাণসাধন কর।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

আজ এই মহাবিজয়যাত্রার পরমপুণ্যদিনে আমাদের অন্তর হইতে রাগ দ্বেষ হিংসা ও পাপচিন্তা বিবাদ বিসম্বাদ, সমস্ত দূরীভূত হইয়া যাউক। আজ হইতে সকলে ভ্রাতৃত্বে, বন্ধুত্বে, আত্মীয়তায় সমপ্রাণ হইয়া পারস্পরিক প্রীতি, শ্রদ্ধা অনুরাগ আলিঙ্গনে পরস্পরকে আবদ্ধ করিয়া যেন সংসার বিজয় যাত্রায় বাহির হইতে পারি। মাতৃস্নেহ মাতৃবাৎসল্য মাতৃ অনুকম্পার অমৃতময়ী শান্তিকুণ্ড জলে পরিস্নান পরিপূত হইয়া নির্ম্মল হইতে পারি। বিশ্বশক্তির প্রতিমা নিরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র অহংকারকে দীনতায় নিমজ্জিত করিয়া এই কল্মষবহুল সংসার পথে নিরঞ্জন থাকিতে পারি।

আমাদের বোধন ও আরাধন সার্থক হউক।

স্মৃতির আলোকে বিগত দিন

শ্রদ্ধেয় সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র

মহারাজজী নিজের ক্যামেরাতে যে সব ছবি তুলতেন নানা দেশে নানা ভক্ত- বৃন্দের সঙ্গে, অনেক সময় কলকাতায় বা অন্য অন্য স্থানে তিনি কীর্তন আসরে না বসা পর্যন্ত কিংবা তিনি এসে আসনে উপবিষ্ট থাকলেও প্রোজেক্টারের সাহায্যে ভক্তশিষ্যদের সেই ছবিগুলি প্রদর্শনের জন্য তাঁর নিজের অবস্থান কক্ষ থেকে বার করে দিতেন সেই ছবিগুলি এবং আমার ভাগ্যফলে আমিও অনেক সময়ে ঐ ছবিগুলি প্রদর্শনের ভার পেতাম। মনে পড়ছে সে সময় এইভাবে ছবি দেখানো প্রায় নিয়ম করেই সব জায়গায় হত কীর্তনের পূর্বে। আজ আর সে ভাবে প্রোজেক্ট করে সাধারণের মধ্যে দেখানো হয়না ছবিগুলি। মহারাজজীর কীর্তন আসরই আজকাল অদৃশ্য হয়ে গেছে, কোন বাড়ীতে সে ব্যবস্থাও থাকে না, ছবি দেখানো হবে কোথায়?

জানিনা সে সব ছবিগুলি কোথায় আছে বা কি অবস্থায় আছে? সে সময় দেখেছিলাম কল্যাণীয়া রমাকে (দত্ত) এই ছবিগুলিকে যত্ন সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করতে তাদের গৃহে। আমার মনে হয় এ ছবিগুলিও সযত্নে রক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত আমাদের। এই ছবিতে পুরানো দিনের অনেক ভক্ত শিষ্যকে ধরে রাখা আছে। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই এগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত বলে মনে হয়।

সেই সময়ে যে ছবিগুলি মহারাজজী প্রোজেক্ট করে দেখাবার জন্য নিজ কক্ষ থেকে বার করে দিতেন, তার মধ্যে একটা ছবির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই সময় সেই ছবিটি আমাদের মনে খুব কৌতুকের সৃষ্টি করেছিল। সে ছবিটি ছিল মহারাজজীর সুদূর ইটালীতে সু-উচ্চ আল্পস পর্বতের শীর্ষে দণ্ডায়মান অবস্থায়, দু'পাশে দাঁড়িয়ে সাবিত্রী মাসীমা ও সুদাম। কৌতুক জেগেছিল তাঁদের দেখে নয়, তাদের অঙ্গের পোষাক ও দণ্ডায়মান মহারাজজীর পোষাকের তারতম্য দেখে। তাঁদের দু জনের অঙ্গে জড়ানো শীতবস্ত্রের স্তূপ বলা যায় কিন্তু মহারাজজীর পরিধানে সেই ফটোতে দেখা গিয়েছিল হাতে একটা ছাতি, অঙ্গে সে সময় যে বহির্বাস ব্যবহার করতেন সেই গেরুয়া বসন ও চরণে একটা রবারের পাদুকা। লিখতে লিখতে সেই ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সেই পাদুকার রঙ ছিল সাদা, পরিষ্কার মনে পড়ছে। মহারাজজীর তখন ছিল শীর্ণদেহ। তার পাশে সুদামকে শীত বস্ত্র পরিধানে একটা ভাল্লুক বলে মনে হচ্ছিল। যে স্থানে তারা দণ্ডায়মান ছিলেন সেটি পর্বতের শীর্ষদেশ বলেই মনে হয়। অন্ততঃ সুদাম ও সাবিত্রী মাসীমার শীত বস্ত্রের ভার দেখে মনে হয়েছিল। কিন্তু মহারাজজীকে তাঁর স্বাভাবিক বসনে পরিহিত দেখেছিলাম। আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। জানিনা মহারাজজীর বহির্বাসের ভিতর কোনো পাতলা সোয়েটার ছিল কিনা?

ক্ষুধা, নিদ্রা, শীত যে মহারাজজী জয় করেছেন এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমি আমার সারা জীবনভোর

তাঁকে দেখেছি, সেগুলিই স্মরণে এনে লিখে রেখে যেতে চাই। কত ঘটনাই ঘটেছিল, যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমি আজও করতে পারি নি। কিন্তু কি করে ঘটেছিল আজও এই শেষ বয়সেও চিন্তা করে সমাধান খুঁজে পাই না। মনে হয় মহাপুরুষদের অর্জিত ঐশী শক্তিই ঐ সব কর্মের মূল উৎস। মহারাজজীকে আমি কখনও শীতে কাতর হতে দেখিনি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তাঁকে কোনো ভারী গরম জামা ব্যবহার করতে দেখিনি আমি। শীতের সময় তাঁর সঙ্গে সূতীর বস্ত্রই দেখতাম। হয়ত বহির্বাসের নিচে পাতলা একটা সোয়েটার কখনও কখনও ব্যবহার করতে দেখেছিলাম।

এই যে শীত জয়, এই যে তিতিক্ষা, মনে হয় সব মহাপুরুষদের সাধনার অঙ্গ। চোখে ভেসে উঠছে অন্য এক সাধুর চেহারা। যখন তাঁকে দেখেছিলাম বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। দুর্দান্ত শীত, নভেম্বর মাসের প্রথমে সুউচ্চ বদ্রীনাথ পাহাড়ের উপর সেই সময় সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কেউ নগ্ন গাত্রে অম্লান বদনে ঘোরা ফেরা করতে পারেন, নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। এঁর কথা যথাসময়ে লিখব। কোন এক বৎসরে আশ্রমে শারদীয়া পূজা চলার সময় মহারাজজী আমাকে তাঁর অবস্থান কক্ষ "মোহন মন্দিরে" ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এই ঘটনা খুব কৌতুককর। আমিও সেই ব্যাপারে জড়িত ছিলাম বা আমার সৌভাগ্যে ঠাকুর আমায় যুক্ত করেছিলেন তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল বলে। আজ লিখতে লিখতে সেদিনের সব ঘটনাগুলি যেন ছবির মত চোখের সামনে প্রতিফলিত হচ্ছে।

সেবারে শারদীয়া পূজার নবমীর দিন তাঁর শয়ন কক্ষে আমাকে ডেকে পাঠান মহারাজজী। আমি তাঁর আদেশ মত সে স্থানে উপস্থিত হলে তিনি আদেশ করেছিলেন—

"তুমি দশমীর দিন সকালে দেওঘর থেকে বার হয়ে সোজা গিরিডি চলে যাবে শ্যামলের গৃহে। আমি বিকালে সেখানে পৌঁছে যাব। এ সংবাদ এখানে কারো কাছে প্রকাশ করবে না। কেউ যেন এ বিষয়ে জ্ঞাত না হয়।"

আমার তখন অল্প বয়েস। মহারাজজী সংবাদটি গোপন রাখতে বলায় আমি খুব কৌতুক অনুভব করেছিলাম, সঙ্গে মজাও লেগেছিল। মহারাজজীর এই নির্দেশের কথা আশ্রমে কাউকে জানাইনি এমন কি আমার স্ত্রী-কন্যার কাছেও অজ্ঞাত রেখেছিলাম। প্রচার করে দিয়েছিলাম যে বিশেষ কারণে আমায় দশমীর দিন সকালেই কলকাতা ফিরে যেতে হবে। মনে আছে সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন আমার কথায়। সকলেরই জানা ছিল যে আমি বিজয়ার পর শিমুলতলা ঘুরে তবে কলকাতায় ফিরব। সেই অনুসারে মাল পত্রও এনেছিলাম। আমার স্ত্রী তো নাছোড়বান্দা যে শিমুলতলা না ঘুরে কলকাতা যাবে না। আশা নিয়ে এত ব্যবস্থা করে এসেছে সে। কিন্তু আমি ফিরে যাবই তাঁকে বলেছিলাম দৃঢ়ভাবে।

দশমী পূজা সমাপনান্তে আমি স্ত্রী-কন্যাসহ দেওঘর থেকে কলকাতা যাবার নাম করে বার হয়ে পড়ি। দেওঘর স্টেশন এসে রেলের টিকিট কেটে জসিডি পৌঁছে তুফান এক্সপ্রেস-এ যাত্রা করি। তখনও কেন জানি না আমাদের গন্তব্যস্থলের কথা আমার স্ত্রীকে জানাই নি। মধুপুর স্টেশন এলে তাকে নামতে বললে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেই স্টেশনে নেমে সব শুনে তার আনন্দের কথা সকলেই অনুমান করতে পারবেন। গিরিডি পৌঁছে মহারাজজীর নির্দেশমত শ্যামলের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলাম। বোধহয় শ্যামলকে আমাদের কথা মহারাজজী আগেই জ্ঞাত করেছিলেন। কারণ আমাদের থাকার ব্যবস্থা সে করেই রেখেছিল।

শ্যামলকে খুব মনে পড়ছে। সেও অকালে চলে গেছে। সে, বয়সে আমার চেয়ে কত কনিষ্ঠ ছিল। সে চলে গেছে চিন্তাতেও মন ব্যথা অনুভব করে। (ক্রমশঃ)

MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC & WELFARE SOCIETY
Rangamati path, Bidhannagar, Durgapur-713212, West Bengal
(A DEDICATED CANCER HOSPITAL)

A LIST OF DONORS (FOR THE PERIOD 21/01/2025 to 30/06/2025)

DATE	RT. NO.	NAME	AMOUNT (RS.)
21-01-2025	1754	Nilanjan Bhattacharya	1,15,000.00
28-01-2025	1712	A Well Wisher, Kolkata	1,001.00
27-05-2025	1718	Ashis Sengupta, Kolkata.	500.00
27-05-2025	1719	Sabita Biswas, Kolkata.	5,000.00
05-06-2025	1720	A Well Wisher, Kolkata	1,002.00
17-06-2025	1743	Arijit Ghosh, Kolkata.	750.00
30-06-2025	744	A Well Wisher, Kolkata.	2000.00

শিবনিবাস হাই স্কুলে ১৯৯৬ সালে গুরু মহারাজের পুণ্য পদধুলির পদার্পনে শিবনিবাস শ্রীশ্রীমোহনানন্দ হাই স্কুলে রূপান্তরিত হয়। সেই স্কুল এই বছর ২০২৫ এ সার্ধশতবর্ষ (১৫০ বছর) পূর্তি হতে চলেছে। গুরু মহারাজজীর পৈতৃক নিবাসের বিদ্যালয় ভবনটি রং করার বিশেষ প্রয়োজন। উক্ত কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

SHIBNIBASH SSM HIGH SCHOOL
STATE BANK OF INDIA BRANCH: KRISHNAGANJ
A/c - 32453396113 IFSC - SBIN0003696/M: 8116400124/9732762961

দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রম সমূহের উৎসবের অনুষ্ঠান সূচী

২০২৫ সাল	১৪৩২ সন	উপলক্ষ্য
২২শে সেপ্টেম্বর	৫ই আশ্বিন, সোমবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ ঘটস্থাপন ও নবরাত্রি ব্রতারম্ভ।
২৭শে সেপ্টেম্বর	১০ই আশ্বিন, শনিবার	শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর শুক্লা পঞ্চমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। সায়ংকালে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর বোধন।
২৮শে সেপ্টেম্বর	১১ই আশ্বিন, রবিবার	মহাষষ্ঠী, শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর ষষ্ঠী বিহিত পূজা প্রশস্তা। সায়ংকালে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস।
২৯শে সেপ্টেম্বর	১২ই আশ্বিন, সোমবার	শ্রীশ্রীদুর্গামহাসপ্তমী। পূর্বাহ্নমধ্যে দ্ব্যাত্মক চর লগ্নে ও চরণবংশে। (কিন্তু কালবেলানুরোধে দিবা ৭।০ মধ্যে পুনঃ দিবা ৮।২৯ গতে পূর্বাহ্ন মধ্যে) শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন ও সপ্তমী বিহিত পূজা প্রশস্তা।
৩০শে সেপ্টেম্বর	১৩ই আশ্বিন, মঙ্গলবার	শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর মহাষ্টমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। সন্ধিপূজা : ঘ: ১।২০।১৫ থেকে সন্ধিপূজারম্ভ। ঘ: ১।৪৪।১৫। গতে বলিদান। ঘ: ২।৮।১৫ সেঃ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন। *গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকামতে।*
১লা অক্টোবর	১৪ই আশ্বিন, বুধবার	শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর মহানবমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। শ্রীশ্রীচণ্ডীযজ্ঞ এবং পূর্ণাহুতি সহিত দেবীর নবরাত্রিক ব্রত সমাপ্ত।
২রা অক্টোবর	১৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার	দশমী। শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর দশমী বিহিত পূজা সমাপনান্তে বিসর্জন প্রশস্তা। বিসর্জনান্তে অপরাজিতা পূজা। বিজয়াদশমী কৃত্য। দুর্গাপুর আশ্রমেও এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।
৬ই অক্টোবর	১৯শে আশ্বিন, সোমবার	প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।১৮ গতে ও রাত্রি ৬।৫৪ মধ্যে শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ও শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা দেওঘর আশ্রমে ও পুরী তীর্থাশ্রমে অনুষ্ঠিত হইবে।
২০শে অক্টোবর	২রা কার্তিক, সোমবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা মহোৎসব ও ভাণ্ডারা।
২২শে অক্টোবর	৪ঠা কার্তিক, বুধবার	দেওঘর আশ্রমে অন্নকূট মহোৎসব ও ভাণ্ডারা।
৩০শে অক্টোবর	১১ই কার্তিক, বৃহস্পতিবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা ও ভাণ্ডারা।
৩০শে নভেম্বর	১৩ই অগ্রহায়ণ, রবিবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর ১২২তম শুভাবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা, সাধুভাণ্ডারা ও কম্বলদান, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের শীতবস্ত্র বিতরণ। জামিরলেন সহ অন্য সকল আশ্রমেও জন্মতিথি উৎসব পালিত হইবে।

দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রম সমূহের উৎসবের অনুষ্ঠান সূচী

২০২৬ সাল	১৪৩২ সন	উপলক্ষ্য
১লা জানুয়ারী	১৬ই পৌষ, বৃস্পতিবার	ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষ্যে কলিকাতাস্থিত জামিরলেন, শ্রীশ্রীবালানন্দ আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর বিশেষ পূজা অভিষেক ও প্রসাদ বিতরণ।
২৩শে জানুয়ারী	৯ই মাঘ, শুক্রবার	দেওঘর আশ্রমে শুভ বসন্তপঞ্চমী তিথিতে ৺শ্রীশ্রীবালা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীমাতার বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক ভাণ্ডারা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা এবং শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা। তৎসহ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালিত হইবে।
২রা মার্চ	১৭ই, ফাল্গুন, সোমবার	সায়ংকালে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা।
৩রা মার্চ	১৮ই, ফাল্গুন, মঙ্গলবার	শ্রীশ্রীদোলপূর্ণিমা, শ্রীশ্রীবিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। দেবীমন্দিরে পরাৎপর গুরু শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ স্থাপনা তিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক।
১৭ই মার্চ ১৯শে মার্চ	২রা, চৈত্র, মঙ্গলবার ৪ঠা, চৈত্র, বৃহস্পতিবার	হৃষিকেশ আশ্রমে সকল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বার্ষিক তিথি উপলক্ষ্যে, ৩ দিবস ব্যাপী শ্রীশ্রীবিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞ, ভাণ্ডারা, দরিদ্রনারায়ণ সেবা।
২০শে মার্চ	৫ই চৈত্র, শুক্রবার	পুরীর শ্রীশ্রীবালানন্দ তীর্থাশ্রমে শ্রীশ্রীমোহনেশ্বর মহাদেব মন্দিরে শ্রীশ্রীনর্মদেশ্বর শিবের ৮ম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ষোড়োশোপচার বিশেষ পূজা রুদ্রাভিষেক, যজ্ঞ এবং ভাণ্ডারা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে।
২১শে মার্চ	৬ই চৈত্র, শনিবার	দেওঘর তপোবন আশ্রমে শ্রীশ্রীপরমগুরুমহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা।
২৪শে মার্চ ২৮শে মার্চ	৯ই চৈত্র, মঙ্গলবার ১৩ই চৈত্র, শনিবার	বাঁকুড়া তীর্থাশ্রমে শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা উৎসব।
২৫শে মার্চ ২৭শে মার্চ	১০ই চৈত্র, বুধবার ১২ই চৈত্র, শনিবার	বারাণসী তীর্থাশ্রমে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মাতার বার্ষিক প্রতিষ্ঠাতিথি ও শ্রীশ্রীপরমগুরুমহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ৩ দিবসব্যাপী লঘুরুদ্র যজ্ঞ, বিশেষ পূজা, পাঠ, অভিষেক, সাধুভাণ্ডারা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করা হইবে।
১৫ই এপ্রিল	১৪৩৩ সন ১লা বৈশাখ, বুধবার	কলিকাতা জামিরলেনস্থিত শ্রীশ্রীবালানন্দ আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর বিশেষ পূজা, অভিষেক ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালিত হইবে।

পুণ্য-পরশ-পুলক (২০শ পর্ব)

শ্রীবসুমিত্র মজুমদার

সাঁইথিয়ার 'মোহন মন্দির'—

আমাদের আর এক আকর্ষণীয় জায়গা। এখানে আমাদের কোনও কাজকর্ম থাকতো না। সারাদিন কেবল আনন্দ আর আনন্দ। এখানে একটা কথা শুনেছিলাম, 'এখানে মহারাজ মহারাজ করবেন না। খাওয়া দাওয়া করুন, দেখুন, ঘুরুন, মহারাজ মহারাজ করবেন না।'- এটা আমাদের তখনকার বুলি হয়ে গিয়েছিল। সত্যি সত্যিই সারাদিন ধরে চারবেলা খাওয়া দাওয়া করতাম, আর মহারাজকে দর্শনের অভিলাষে দিন যাপন করতাম।

আমরা বেশির ভাগই যেতাম জগদ্ধাত্রী পুজোর সময়ে। সেখানে ওই সময় গুরুমহারাজ জগদ্ধাত্রী পুজো করতেন। পুজোর সময় উপস্থিত থেকে পুজো দেখতাম, অঞ্জলি দিতাম। আর ভাবতাম, ওই ব্রাহ্মণের কী সৌভাগ্য, তিনি গুরুমহারাজকে মন্ত্রপাঠ করাচ্ছেন। ওইখানেই জেনেছিলাম জগদ্ধাত্রী পুজোয় একদিনে তিন তিথির পুজো হয়। গুরুমহারাজ এলে আমরা নন্দীকেশ্বর মন্দিরের কাছের একটা লজ-এ থাকতাম। সাত নম্বর ঘরটা আমাদের নির্দিষ্ট ছিল। ঘরটা অনেক দিন আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রাখতাম।

জগদ্ধাত্রী পুজোয় আর অন্যান্য দু একবার ওখানে গুরু মহারাজের পুণ্যপরশ পেয়েছিলাম। একবার বোধহয় লক্ষ্মীপুজোতেও তাঁকে সেখানে প্রণাম করেছিলাম। প্রসাদী হিসেবে মা লক্ষ্মীর সিঁদুর মাখানো কড়ি পেয়েছিলাম। সে কড়ি এখনও রাখা আছে।

সাঁইথিয়ার 'মোহন মন্দির' বিরাট বড় বাড়ি। তার নিচের তলায় থাকতো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। দোতলায় বাড়ির লোক ও অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা আর তেতালায় গুরুমহারাজ বসতেন। তেতালার ওপর ছাউনি দেওয়া ছাদের একপ্রান্তে পুজোর মণ্ডপে পুজো হতো অপর প্রান্তে প্রণামের লাইন পড়তো আর কীর্তনের আসর বসতো।

তেতালায় গুরুমহারাজ যে ঘরে বসতেন, সেই ঘর গুরুমহারাজের অবস্থানের তুলনায় অনেকটাই ছোট বলে আমাদের মনে হত। আমরা বসতাম ঘরের সামনের বারান্দায়। যদিও আমাদের আগে অনেকেই এসে ঘরের দরজার সামনে অংশটা দখল করে নিতেন। কারও কারও আবার রুমাল দিয়ে জায়গা রাখা থাকত।

আমরা যেখানে বসতাম, সেখান থেকে গুরুমহারাজকে দেখাই যেত না। যতক্ষণ প্রণাম চলত, ততক্ষণ আমরা নিজেদের মধ্যে গজল্পা করতাম। এমনকি হরির লুটও ঠিক মতো পেতাম না। অথচ, কী এক অমোঘ আকর্ষণে বসে থাকতাম বলতে পারি না। কখনও কখনও মহারাজ ওই ঘরে বসেই কীর্তন করতেন। আমরা শুনতাম, দোহার দিতাম, কিন্তু তাঁকে দেখতে পেতাম না।

সে বাড়িতে যে সব কাজের লোক ছিলেন তাঁরা ওই সময় কী অক্লান্ত অমানুষিক পরিশ্রম করতেন! সে পরিশ্রম তাঁদের মনিবের ভয়ে, না, গুরুমহারাজের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিতে জানি না। তাদের মধ্যে একজনের নাম জেনেছিলাম 'কালো'।

একদিন শুনলাম বিকেলবেলা গুরুমহারাজ বেড়াতে বেরবেন। একটা ওই টেম্পো ট্রাভেলারের মতো মিনিবাস এসেছে। কিন্তু ওতে তো আমাদের ঠাঁই হবে না। আমরা কিসে যাব? ভাবতে ভাবতেই দেখি একটা লরী এসে পৌঁছালো। যাঁদের যাবার ইচ্ছে, তাঁরা ওই লরীতে চড়ে যাবেন। কিন্তু লরীতে কোনও চাদর বা সতরঞ্চি বিছানো নেই। অনেকেই ভাবছেন কী করবেন, তবে কী দাঁড়িয়ে যেতে হবে? ইতিমধ্যে

আমাদেরই মধ্যে একজন নবকুমার দার মতো গলা করে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে কালো! লরীর উপর সতরঞ্চিটো বিছায় দে।' 'যাই বাবু' বলে, কালো, সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে করে দুটো বড় সতরঞ্চি এনে লরীতে বিছিয়ে দিল। তার পরেই বয়স্কাদের লরীতে ওঠার হিড়িক পড়ে গেল। মাসীমা পিসীমারা সেদিন যে কী ভাবে লরীতে ওঠা নামা করেছিলেন তা ভাবলে আজও আশ্চর্য লাগে।

কিছু আয়োজনের হয়তো তখনও বাকি আছে, তাই সকলে গাড়িতে চড়েন নি। গাড়ির কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছেন। বাড়ি থেকে উঠোনে নামতেই ডান দিকে একটা দোলনা রাখা ছিল। কিছু করার নেই তাই ওই দোলনায় বসে কিছুক্ষণ দোল খাচ্ছিলাম। গুরুমহারাজ আসছেন শুনে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। গুরুমহারাজ তিনতলা থেকে নেমে এলেন, তিনি ওই মিনিবাসে যাবেন।

কিন্তু তখনও আয়োজন সম্পূর্ণ হয় নি। তাই কিছু সময় অতিবাহিত করতে হবে। বোধ হয় সেই সুযোগেই গুরুমহারাজকে কে যেন ওই দোলনায় বসতে অনুরোধ করলেন। দেখলাম, অভিমানশূন্য তিনি শিশুবালকদের মতো দোলনায় বসে দুলতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ কেউ কেউ সেই দুর্লভ দৃশ্য সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরায় বন্দী করে নিলেন। আমরাও দুচোখ ভরে দেখলাম মহারাজের অন্যরকম বাল্যলীলার ভাব।

কিছুক্ষণ পর চললেন বাসের দিকে। মহারাজের বসার আসন নিয়ে একজন চলেছেন। বাসে উঠে সীটের ওপর আসন বিছাতে গিয়ে তিনি দেখলেন সেখানে অনেক পিঁপড়ে। দেখেই, স্বাভাবিক ভাবেই, তিনি হাত দিয়ে ডলে ডলে পিঁপড়ে মারতে লাগলেন। তাই দেখে মহারাজ কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে আর্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'না, না, ওদের মেরো না, ওরা আমায় কোনো অসুবিধা করে না।

সেদিন যে কোথায় কোথায় ঘুরেছিলাম সে কথা আর মনে পড়ছে না। তবে এটা মনে আছে যে নন্দীকেশ্বর শিবের মন্দিরে গুরুমহারাজ শিবলিঙ্গে জল ঢেলেছিলেন। আমরাও সেই মতো শিবকে স্নান করিয়েছিলাম। স্নান করানো যেন আর শেষই হয় না। কেন না, লরীতে যতজন ছিলেন প্রায় সবাই সেই সুযোগের সদব্যবহার করেছিলেন।

সাঁইথিয়ার মন্দিরে শিবপুজোর কথা মনে এলেই আমার আরও একটা দুর্লভ ভাগ্যময় দিনের কথা মনে পড়ে যায়। সেবার শিবরাত্রি তিথিতে দেবাদিদেব কোলকাতায় অবস্থান করেছিলেন। সেদিন তাঁর চরণ দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কোলকাতার কোথায় তা আর মনে নেই। কেননা, মাসীমেসোর সঙ্গে গিয়েছিলাম সেখানে। বেলা সাড়ে এগারোটা বারোটা নাগাদ শোনা গেল কাছাকাছি কোনও মন্দিরে তিনি যাবেন। কারও একটা গাড়িতে আমার জায়গা হয়ে গেল।

প্রথমে কয়েকটি মন্দিরে যাবার পর তিনি গেলেন কালিঘাটের কাছের এক শিবমন্দিরে। মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখলাম শিবলিঙ্গকে ঘিরে গুরুমহারাজের সঙ্গে আমরা মাত্র জনা কয়েক দাঁড়িয়ে আছি। হাতে ফুল বেলপাতা দিয়ে মহারাজজী অঞ্জলি দেওয়ালেন। তারপর নিজে শিবের মাথায় জল ঢেলে আমাদের প্রত্যেককে দিয়ে সমস্ত্র জল ঢালালেন। সাক্ষাৎ শিবের কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রের সঙ্গে শিবরাত্রির তিথিতে সেই পুজো আমার স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। (ক্রমশঃ)

ভ্রমণের অভিজ্ঞতা (বৈদ্যনাথ ধাম)

শ্রীমতী সোমা মুখোপাধ্যায়

জয়গুরু, জয়গুরু—

২০২৪-এর দুর্গাপুজোর দশমীর দিন আমার মেয়ের ইচ্ছানুসারে আমরা সকল পরিবারবর্গ গাড়ি নিয়ে বৈদ্যনাথ ধামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম। শুরুটা হয়েছিল ভালই। দুর্গাপুর থেকে সকাল আটটা নাগাদ যাত্রা শুরু করে অণ্ডাল, আসানসোল, রূপনারায়ণপুর, চিত্তরঞ্জন, মিহিজাম, জামতাড়া হয়ে ১৫৬ কিঃমিঃ পথ পাড়ি দিয়ে দুপুর একটা নাগাদ দেওঘর পৌঁছলাম। পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী আমরা নিজেদের গুরু আশ্রমের যাত্রী নিবাসের দোতলায় পাশাপাশি দুইটি ঘর পেয়ে, ব্যাগপত্র সেখানে রেখে একতলায় খাবার ঘরে গিয়ে শ্রীগুরুদেব ও দেবীমায়ের ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করে আমরা আবার নিজেদের নির্দিষ্ট ঘরে এলাম বিশ্রামের নিমিত্তে। এরপর সন্ধ্যা ছটা নাগাদ আশ্রমের বিভিন্ন মন্দির পরিদর্শন, সাধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও প্রণাম করে, আশ্রমের সকল মন্দিরের পুজো পাঠ দর্শনান্তে রাতের প্রসাদ পেয়ে সেদিনের মত শুতে গেলাম।

পরদিন ছিল একাদশী, সকাল আটটা নাগাদ বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে পৌঁছে দর্শন ও পুজোপাঠ শেষ হতে হতে বিকেল তিনটে বেজে গেল। কাজেই আমরা পাশের একটি হোটেলে দুপুরের আহারাদি সেরে বিকেল পৌনে পাঁচটা নাগাদ আমরা 'সৎসঙ্গ', 'ভারত সেবাশ্রম' ও 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন' পরিদর্শনে গেলাম। সেখানে ঠাকুর মা স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পণ করে পৌঁছলাম ৺অনুকূল ঠাকুরের আশ্রমে। আমার শ্বশুরমশাই কিছুতেই গাড়ি থেকে আর নামতে চাইলেন না। আমরা ওনাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে বাইরে থেকে দরজা লক করে চলে গেলাম। ঐ আশ্রমে সেদিন বিশেষ কোনও উৎসব ছিল, আশ্রম প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য আর সকলেই সান্ধ্যকালীন ধ্যান জপে মগ্ন ছিলেন। কিছু কিছু জন একটু আধটু আনাগোনা করছেন। পুরুষমানুষেরা সকলেই সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত।

আমরা ঠাকুর বাড়িতে গেলাম— সেখানে প্রণাম নিবেদন করে, মিউজিয়াম, গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে আধঘন্টা পরে গাড়িতে ফিরে এসে দেখি বাবা গাড়িতে নেই। একানব্বই বছরের অশীতিপর বৃদ্ধ ভেতর থেকে লক খুলে কীভাবে নেমে গেলেন আমরা তো ভেবেই আকুল হলাম তাছাড়া উনি ভালভাবে কথাও বলতে পারেন না, সাপোর্টছাড়া একা একা হাঁটতেও পারেন না, তাঁর কাছে কোনও টাকা পয়সাও নেই। কোথায় যেতে পারেন এই অক্ষম মানুষটি— এই কথা চিন্তা করে আমরা অস্থির থেকে অস্থিরতর হতে লাগলাম। শ্রীগুরু গোবিন্দ ও দেবীমাকে আমরা তিনজনেই মনে মনে স্মরণ করতে লাগলাম। একদিকে শ্রীগুরুকে স্মরণ আর তার সাথে তারকব্রহ্মনাম করতে থাকলাম। করজোড়ে বাবা বৈদ্যনাথের উদ্দেশ্যে 'হর হর মহাদেব' বলতে লাগলাম আমরা তিনজনে তিনদিকে পাতি পাতি করে খুঁজতে লাগলাম। আমার শ্বশুরমশাই সাদা পাজামা ও পাঞ্জাবী পরে থাকায় বোধ হয় চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল।

এই করতে করতে রাত দশটা বাজল, পাঁচঘন্টা সময় অতিক্রান্ত আমার মেয়ে দাদামণি-ই করে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। আমার স্বামীও ধৈর্য্যহারা হয়ে বাবাগো বলে কাঁদতে শুরু করে দিল, এমতাবস্থায় আমি দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান শূন্য, কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছি। কী যে করি ভেবে পাচ্ছি না। ওদের দুজনকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই। আমাদের আশ্রমের কেয়ারটেকার শ্যামকে ফোনে জানালাম দাদু মিসিং সৎসঙ্গ আশ্রমে এসে তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না, আমাদের ফিরতে রাত হবে, আমি পৌঁছে তোমাকে ফোন করে নেব। ইতিমধ্যে আমার স্বামী ও মেয়ে রেলওয়ে স্টেশন ও বাস স্ট্যাণ্ডে খোঁজ করে এসেছে, মোবাইল থেকে ফোটোপ্রিন্ট বার করে পুলিশ স্টেশানে দিয়ে এসেছে। চারদিকে ফোটো বিতরণ করা হচ্ছে; মাইকে ঘোষণা করাও হচ্ছে। কিন্তু না, কোনও হদিশ নেই। শেষ পর্যন্ত যখন রাত প্রায় সাড়ে বারোটা, আমরা আশাহত হয়ে শেষ বারের মতো আরও একবার বাসস্ট্যান্ডের অভিমুখে রওনা হয়েছি এমন সময় আমাদের কেয়ারটেকার শ্যাম আমাকে ফোন করে বলে যে কাকীমা তুমি ঐ আশ্রমে ফিরে যাও— ঐ আশ্রমে ছোড়দার বাড়িতে দাদু রয়েছেন। ঐ আশ্রমের খবর পেয়ে ওখানে যোগাযোগ করি, ওর বন্ধুর বাবা আমাদের বালানন্দ আশ্রমের মালী। বন্ধুটিও দুর্গাপুর আশ্রমে এসেছিল একবার দুর্গাপুজোয়, তাই সে বাবাকে ভালোভাবে চিনত। অপ্রত্যাশিতভাবে বাবা সেদিন ঐ বাড়িতে ঢুকে পড়েন এবং শ্যামের বন্ধু বুঝতে পেরে যায় যে তাহলে ঐ দাদুই মিসিং। আমরা পুনরায় ছোড়দার বাড়িতে যাই ও তাঁকে নিয়ে ফিরে আসি— আমাদের অপেক্ষার প্রহর গোণার অবসান ঘটে। গুরু কৃপাহি কেবলম্‌। তাঁর কৃপা ব্যতিরেকে কিছুই সম্ভব নয়।

পরের দিন আমরা দেওঘরের বাকী সমস্ত জায়গা দর্শন করে যখন ফিরছি, তখন গেল গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে। সন্ধে হয়ে আসছে— গাড়ি আর নড়েনা-চড়েনা। রাস্তা শুনসান, জনমানবশূন্য বলা যায় কেবল মাঝে মধ্যে দু-একজন বাইক আরোহীকে যেতে দেখা যাচ্ছে। অনেক দূরে মাঠের প্রান্তে গায়ে গায়ে দু'চারটি কুঁড়ে ঘর দেখা যাচ্ছে। আকাশে কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদ তার অপূর্ব শোভা নিয়ে জ্বল জ্বল করছে। দূর থেকে ভেসে আসা উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি মনে করিয়ে দিচ্ছে আজ কোজাগরী পূর্ণিমা। তখন সন্ধ্যা ছটা, নির্জন রাস্তায় শেয়ালের হুক্কা হুয়া ডাক আর ইতিউতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গাছের ছায়া দেখে গা ছম ছম করছে। তার বেশ কিছুক্ষণ পর একজন বাইক আরোহী যেন দেবীমা-গুরু মহারাজজীর দূত হয়ে এসে আমাদের সাহায্যের হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন। ওঁনার তৎপরতায় গাড়ি ওয়ার্কশপে পৌঁছয় ও পরদিন দুপুর দুটো নাগাদ আমরা গাড়ি ফেরৎ পাই।

দুপুর বেলায় আশ্রমের ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করে আমরা দুর্গাপুরের পথে রওনা হই। তবে স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে গাড়িতে আমরা চারজন বসা আর ক্রেন এসে সেই গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে ধূ ধূ পথ দিয়ে। এই বারের দেওঘর ভ্রমণ সারা জীবনে ভোলবার নয়। হয়তো অনেক বড় বিপদ থেকে গুরুদেব আমাদের রক্ষা করবেন বলেই টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

জয়গুরু

শ্রীশ্রীদুর্গাশক্তি

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল

বেদান্ত শাস্ত্রে যাঁকে ব্রহ্ম বলা হচ্ছে আর শাক্ততন্ত্রে যিনি ব্রহ্মময়ী তাঁরা কিন্তু অভিন্ন বা অদ্বয়—একই সত্তার ভিন্ন নাম মাত্র। আমরা যদি একটু মনঃসংযোগ করি এই ব্যাপারটা নিয়ে তাহলে বুঝতে পারব এ এক গভীরতত্ত্ব। বেদান্তের ব্রহ্ম আকারহীন ক্রিয়াহীন, আবার তন্ত্রশাস্ত্রে এই ব্রহ্মকে শিব আখ্যা দেওয়া হয়েছ। শিব ও শক্তি পরস্পর সম্বন্ধে যুক্ত। শিবরূপী পরমসত্তা কিন্তু এখানে নিষ্ক্রিয়। শক্তিকে তাঁর প্রকাশ বা ক্রিয়ারূপে গণ্য করা হয়।

এই শক্তিই শিবের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পরম সত্তা না পুরুষ না নারী; পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই। সেই জন্য কোনও কোনও পুজোর প্যাণ্ডেলে অর্ধনারীশ্বরের মূর্তি পুজো করা হয়; যে রকম বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তির পুজো করা হয়। কৃষ্ণকে মুলাধার হিসাবেও কল্পনা করা হয়— তাই বলা হয়ে থাকে 'প্রকৃতির অর্দ্ধ অঙ্গে রাধার জনম'। যদিও শিবরূপী মহাসত্তা নিষ্ক্রিয় শক্তি কিন্তু সক্রিয়। তাই আমরা তাঁর প্রকাশ অনুভব করতে পারি। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণ আমাদের গুরুদেব এবং অন্য সকল মহাত্মারা বলেছেন ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ; এককে বিশ্বাস করলে আর একটিকেও বিশ্বাস করতে হয়। অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি, সূর্য্য আর সূর্য রশ্মি এক এবং অভিন্ন উভয় উভয়ের পরিপূরক প্রকাশমাত্র।

শিবের সঙ্গে শক্তির সংযোগেই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। তাই সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে যিনি সম্ভব করেছেন তিনিই জগতের কর্তৃ আদি শক্তি তিনিই; সপ্তসতীতে মহামায়া বলে পরিচিতা—

'মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী"।। শ্রীশ্রীচণ্ডী ২।৭৭

জীবনের সব কর্মই এক শক্তির প্রভাবেই সম্পন্ন হয়। আজ যে শক্তির উপাদান রয়েছে সম্ভাবনার স্তরে সুপ্ত, কালই সেই শক্তি উৎসমুখে এসে হয়ে উঠছে এক নবীন জীবনধারার জীবন-বল আর এই বলই চলমান শক্তির উৎস। জীবনের সবকিছুই এক অখণ্ড উৎসভূমি থেকেই সমাগত এই উৎসভূমিই হ'ল দুর্গাশক্তি। দুর্গা চেতনাকে আশ্রয় করেই আবাহন করতে হয় দুর্গাশক্তি। এই শক্তিই জীবন প্রদীপ হয়ে জীবনের গতিকে ভাগবতী অভিমুখী করে তুলতে পারে। গুরুমহারাজজী তাই গানের মাধ্যমে বলেছেন—

"নিজেরে বাঁধিয়া তুমি নিজেই করিছ লীলা
নিজেরে করিতে মুক্ত চলেছে অনাদি খেলা...."। কাজেই সর্ববাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলার শক্তির প্রেরণা তিনিই। দেবীশক্তিই জীবনের সাধনের বীজ হয়ে জীবন ও সাধন পর্বকে পূর্ণতার অভিমুখে নিয়ে যায়। সাধক অনন্ত সাগর সমুখে যতই এগিয়ে চলে অনুভবের ঢেউ যেন সৃষ্টির পথকে করে তোলে দুর্গম। সাবধানবাণী সাধকের কণ্ঠ নিঃসৃত—

সত্য পথে মন করো আরোহন প্রেমের আলো

জ্বালি চল অনুক্ষণ সঙ্গেতে সম্বল রাখো পুণ্যধন গোপনে অতি যতনে।"

আবার বলছেন, 'লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ পথিকের করে সর্বস্ব হরণ,
পরম যতনে রাখো রে প্রহরী শম-দম দুইজনে।।'

অর্থাৎ আমাদের দেহে যে ছয় রিপু আছে সাধন পথে তারা বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করে সাধকের পথকে পিচ্ছিল করার চেষ্টা করে; এই পথে যে অনেক কাঁটা। বড় মহারাজজী বলেছিলেন যদি তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে পৌঁছতে হয় তাহলে ঐ কাঁটা-ঝোপঝাড় পেরিয়ে যেতে হবে— এতে সময় কম লাগলেও অনেক বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে।

এই কঠিন পথে আরোহণের জন্য যে ছয়টি রিপু আমাদের বাধা সৃষ্টি করে পথ আটকায় সেই রিপুদেরকে কীভাবে জয় করা যায় সেই মন্ত্রও আমাদের গুরুমহারাজজী বলে দিয়েছেন—

'কামেরে' করিব অর্পন কৃষ্ণকামনায়,
ভক্তদ্বেষী-জনে 'ক্রোধ' রাখিব সদাই।
সাধু সঙ্গ হরি কথায় 'লোভ' কবে হবে,
কবে কৃষ্ণরূপে 'মোহ' মুগ্ধ হয়ে যাবে।
শ্রীকৃষ্ণ দাসত্ব 'মদ' কভু না ছাড়িব
ভক্তিধন ধনীজনে 'মাৎসর্য্য' রাখিব।
ভুবন মঙ্গল যিনি তাঁর যাহা দান—
দেহে ছয় রিপু হবে মিত্রেরই সমান।।

জগন্মাতা দেবী দুর্গার আনুকূল্যেই সাধন। তিনিই যুগিয়ে দেন ভক্তির শক্তি, সাধনের শক্তি— তিনিই করেন ভিতর ও বাহিরের সকল মালিন্যের শোধন। দেবী শক্তিই জীবনের ও সাধনের শক্তি বীজ হয়ে জীবন ও সাধন পর্বকে ত্বরান্বিত করে পূর্ণতার অভিমুখে নিয়ে যায়। কালের এই রথযাত্রায় নিত্যসঙ্গী দেবী স্বয়ং। সাধক যখন মাতৃ উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করেন, তখনই তিনি অমিত শক্তির অধিকারী হন; তখন তাঁর অসাধ্য কিছুই থাকে না। যে অদ্বয় সত্য থেকে জীবের উৎপত্তি ঘটেছে, সেই অদ্বয় সত্যে তিনি বিলীন হয়ে যান। তখন ভক্ত আর ভগবানের মধ্যে কোনও তফাৎ থাকেনা। শক্তির উপাসকরা মানসপূজার মধ্য দিয়ে তখন প্রকৃত আনন্দলাভের অধিকারী হন। তখন তাঁদের আর বাহ্যিকতার দিকে মন থাকেনা— তাঁদের অন্তরে এই ভাবনাই সঞ্জীবিত হয়—' জাঁক জমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে; ও তুই লুকিয়ে তাঁরে করবি পূজা জানবে নারে জগৎজনে..."।

প্রকৃতপক্ষে দুর্গারূপী শ্রীগুরুর নামে ভয় ভাবনা, যম-যাতনা কিছুই থাকে না। শক্তির প্রকৃত অনুভূতির মধ্য দিয়েই দুর্গাশক্তির মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব। তবে আমাদের উপলব্ধি ঐ গানটিতে প্রকাশমান—

"আমার ইষ্ট কে তা আমি না জানি,
আমি গুরু ছাড়া কিছু না মানি।
সে কি দুর্গা-সে কি কালী
সে কি কৃষ্ণ কেশব বনমালী....।"

জয়গুরু

শিবাণী পীঠ

শ্রীমতীরীণা মুখোপাধ্যায়

আসন্ন শারদীয়া উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীগুরুচরণে জানাই অনন্তকোটি প্রণাম। মহামায়ার আগমনে আকাশ বাতাস মুখরিত। মানুষের মনে প্রফুল্লতা জাগিয়ে বিশ্ব প্রকৃতি নব রূপে নব নব সাজে সেজে উঠেছে। প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে ঢাকের বোলের আগমনীসুরে শোনাই দেবীমাহাত্মের কিছু কথা।

কোলকাতার খুব কাছেই এই জাগ্রত মন্দিরে মায়ের পায়ের মাটি ও ফুলে দূর হয় যে কোনও কঠিন ব্যাধি। জাগ্রত মায়ের মন্দিরে ব্যাধি নিরাময় করতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন অসংখ্য ভক্তবৃন্দ, ভক্তেরা বলেন—এই মন্দিরে পুজো দিলে সকল মনোস্কামনা পূরণ হয়। মা কাউকে শূন্য হাতে ফেরান না। স্থানীয় বাসিন্দাদের বিশ্বাস মা এখানে জীবন্ত রূপেই অবস্থান করছেন। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই রয়েছে নানা অলৌকিক কাহিনী। বহু বছর আগের কথা, বারুইপুরের সুবুদ্ধিপুর এলাকায় এই শিবানী পীঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সিদ্ধপুরুষ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য। এই মন্দিরে পুজো দিতে এসে অনেক ভক্তরাই নাকি মা শিবানীর নিঃশ্বাস অনুভব করেছেন। মন্দিরের গঠন শৈলী একেবারে ছিমছাম। মূল মন্দিরে প্রবেশ করার আগে নাট মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। নাটমন্দির পেরোলেই মূল মন্দিরে মা শিবানীর বিগ্রহর দর্শন পাওয়া যায়। সকাল সাতটার সময় মন্দির খোলা হয়। পুজো দেবার সময় সকাল আটটা ও সন্ধে সাড়ে ছটা। সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্য্যন্ত মন্দির বন্ধ থাকে। মা শিবানীকে উগ্ররূপে দেখা যায় না। প্রাচীন ইতিহাস বলছে স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাতা হন মাঁ শিবানী। মা শিবানী মাকালীরই আর এক রূপ। এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য শ্রীনারায়ণ দাস ও তাঁর স্ত্রী শান্তিলতা দেবীর কন্যা নিরুপমার বিবাহ হয় কাঁচড়াপাড়ায়। শ্বশুর বাড়িতে থাকাকালীন নিরুপমা দেবী একদিন স্বপ্ন দেখলেন, —বাপের বাড়িতে শ্রীপঞ্চানন দেবের মন্দির হচ্ছে। পঞ্চানন মন্দিরের বাঁপাশে পুকুরের জলে একটি দেবীর ঘট পড়ে রয়েছে। স্বপ্নের মধ্যেই সেই ঘটটা তুলতে গেলে তার সামনে এক কালীমূর্তি আবির্ভূতা হন। সেই কালীমূর্তি তাকে নির্দেশ দেন কোথায় ঘটটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিছুদিনের মধ্যে নিরুপমা দেবী বাপের বাড়ি আসলে, তার জ্যাঠামশাই সেই পুকুর থেকে ঘটটি খুঁজে পান। এরপর বাংলার ১৩৭৩ সনে মঙ্গলবার নবমী তিথিতে কাঁসর-ঘন্টা-বাদ্যযন্ত্র সহ মন্দিরে ঘটটি প্রতিষ্ঠা করেন শ্রী দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য। প্রথমে এখানে মায়ের নাম ছিল ভবানী। পরে আবার দুর্গাদাস স্বপ্নাদেশ পান তাঁর মেয়ের নামে মায়ের নাম রাখার জন্য। সেই থেকে এই মন্দির শিবানী পীঠ নামে পরিচিত সকলের কাছে।

মা এখানে চতুর্ভূজা, উচ্চতা প্রায় চার ফুট। মাকে প্রতিদিন আমিষ ভোগ দেওয়া হয়। ভোগে থাকে সাদা ভাত, তরকারি, মাছ, চাটনী ও পায়েস। অতীতে এখানে বলি প্রথা চালু থাকলেও বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী মায়ের কাছে পুজো দিয়ে যদি তাঁর পায়ের মাটি এবং ফুল সংগ্রহ

করতে পারেন কোনও ভক্ত, তাহলে কখনোই শরীরে কোনও ব্যাধি বাসা বাঁধতে পারে না। তবে আজকাল মায়ের মাটি কাওকে দেওয়া হয় না। এই মন্দির ঘিরে অনেক অলৌকিক ঘটনা শোনা যায়।

ভট্টাচার্য্য বাড়ির পাশের বাড়িতে একটি ছেলে দীর্ঘকাল ধরে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভুগছিল। তারপর সেই ছেলেটির মা এই শিবানীপীঠে এসে ছেলের মঙ্গল কামনা জানান। ঠিক সেদিন রাত্রে নিরুপমাদেবীর স্বপ্নে আবারও দেবী আবির্ভূতা হন। তাঁকে জানান, মন্দির থেকে কিছু দূরে একটা পদ্মপুকুরে একটা কুঁড়ি দেখতে পাওয়া যাবে। মা শিবানীর নির্দেশ অনুযায়ী ছেলেটির মা সব নিয়ম পালন করার পর ছেলেটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। এই জন্যই বলা হয়— 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।'

"তোমায় কী দিয়ে পূজিব ভগবান
আমার বলিতে কিছু নাই হরি
সকলিতো তোমারই দান..."।

শ্রী শ্রী গুরুদেবের চরণে জানাই অন্তরের অনন্তকোটি প্রণাম।

জয় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী কী জয়।

সপ্তমী (কবিতা)

শ্রীমতী অরুণিমা বসুমল্লিক

ভবের সাথে ভবানী আজ এল যে
মোর ঘরে
তোরা উলু দেরে শঙ্খ বাজা
আনন্দে মাত উঠে সকলে।।

আলো করে লক্ষ্মীদেবী বসে মায়ের সাথে
গণপতি দুলায়ে মাথা
বলেন ক্ষুধা পেটে
শ্বেত বসনা সরস্বতীর
আশীষ পরে ঝরে
কার্ত্তিকেরও শোভা বড়
ময়ূর পৃষ্ঠে চড়ে।।

দ্বিভুজা আজ দশভূজা অবাক হয়ে দেখি
কোথায় আমার গৌরী ওগো
মা ভুলেছে সে কি
মহামায়ার মায়ায় ভুলে
ভাবি আমার কন্যা
জগত তো তার হাতের মুঠোয়
দশটি হাতের খেলনা।

সকল ভুলে বুকের মাঝে
পরশ করি তারে
আদর করে বসাই ঘরে
বাঁধি স্নেহের ডোরে।।

শ্রীশ্রীবালানন্দের ঈশ্বরী শ্রীশ্রীবালেশ্বরী মা

ভক্তের অনুভূতিতে (২য় পর্ব)

শ্রীসোমনাথ সরকার

প্রথম পর্বে আমি লিখেছিলাম যে এই লেখাটি সম্পর্কে ভূমিকা আমি প্রথমপর্বে না দিয়ে পরবর্তী কোনও পর্বে দেব। এই পর্বে তাই আমি প্রথমেই জানাতে চাই যে এই লেখার প্রেরণা আমি কীভাবে পেলাম।

দেওঘরে করণীবাদে আমাদের গুরুমহারাজজী শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর নামাঙ্কিত শ্রীশ্রী বালানন্দ (রামনিবাস) ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যাঁরা গেছেন, তাঁরা যখন শ্রীশ্রীবালেশ্বরী ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী মায়ের মন্দির থেকে বের হয়ে নিমচবুতরার পাশ দিয়ে (এখানে জানিয়ে রাখি চবুতরা কথাটির অর্থ হচ্ছে চাতাল) এসে শ্রীশ্রী মোহনমন্দিরের দিকে যাচ্ছেন, তখন বাঁদিকে একটা বাড়ির একতলার কাঁচ দিয়ে ঘেরা অংশে দেখা যায় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর ব্যবহৃত গাড়িগুলিকে। আর উপরের দোতলার পুরো দেওয়াল জুড়ে ছোট ছোট মোজাইক পাথর দিয়ে তৈরি বিশাল একটি ম্যুরাল (Mural)। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে আদিগুরু শঙ্করাচার্য্য তাঁর প্রধান শিষ্যকে নিয়ে বসে আছেন যাঁর পিছন দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অলকানন্দা নদী এবং পিছনের একপাশে যোশীমঠ এবং অপর পাশে বদ্রীনাথের মন্দির। পিছনে লেখা অথর্ববেদ। তারপিছন দিকে দেখা যাচ্ছে বরফে ঢাকা হিমালয় পর্বতের চূড়া। পৃথিবী বিখ্যাত চিত্রকর রাজা রবি বর্মার বিখ্যাত চিত্র যেটি ১৯০৪ সালে আঁকা, তার ভাবটাই কিছুটা তুলে ধরা হয়েছে, যদিও মূল ছবিটিতে পিছনের বদ্রীবিশালের মন্দিরটি নেই এবং আদি শঙ্করাচার্য্যকে দেখা যায় একটি গাছতলায় তাঁর চার প্রধান শিষ্যকে নিয়ে বসে আছেন। তাঁর এই চার প্রধান শিষ্যরা হলেন বাঁদিক থেকে পদ্মপাদাচার্য্য, সুরেশ্বরাচার্য্য, হস্তামলকাচার্য্য এবং তোটকাচার্য্য।

আমাদের আশ্রমে চিত্রিত ছবিগুলো সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে কয়েকটি কথা আলোচনা করে নিতে চাই। স্বয়ং দেবাদিদেব শঙ্করের অবতার আচার্য্য শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরের নির্দেশে হিন্দুধর্মের গ্লানি দূর করে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের দ্বারা নিপীড়িত ও কলুষিত হিন্দু ধর্মকে পুনর্জাগরণ ঘটানোর উদ্দেশ্যে। তিনি সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের তর্কের দ্বারা পরাজিত করে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। সারা ভারতের সমগ্র হিন্দু সাধকদের দশটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে নাম দিয়েছিলেন দশনামী সম্প্রদায় এবং ভারতবর্ষের চারটি দিকে চারটি মঠ স্থাপন করে এই দশটি সম্প্রদায়কে বিভিন্ন মঠের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন।

পূর্বদিকে পুরীতে গোবর্ধন মঠ—পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠ— দক্ষিণে রামেশ্বরের কাছে শৃঙ্গেরী মঠ এবং উত্তরে যোশীমঠ। আমাদের আশ্রম এই যোশীমঠের অন্তর্গত। যোশীমঠ বা জ্যোর্তিমঠের আম্নায়ের নাম উত্তর আম্নায়।

সম্প্রদায়ের নাম— আনন্দবার অর্থাৎ সিদ্ধিদাতা।

পদবী— গিরি, পর্বত, সাগর।

ব্রহ্মচারী— আনন্দ, দেবতা-নারায়ণ।

আচার্য— ত্রোটকাচার্য্য। ক্ষেত্র-বদ্রীকাশ্রম তীর্থ-অলকানন্দা।

মহাবাক্য— অয়মাত্মা ব্রহ্ম, বেদ-অথর্ববেদ।

প্রত্যেক মঠ কী নিয়মে চলবে সেই 'মহানুশাসন' নির্দেশ তিনি লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, এখনও পর্যন্ত সারা পৃথিবীর সমগ্র হিন্দুসমাজ সেই নিয়মানুসারেই চলছে। এইজন্য আমাদের আশ্রমের ছবিটির পিছনে শ্রীশ্রী বদ্রীনাথের মন্দির, যোশীমঠ এবং অলকানন্দা নদী। উপরে মহাবাক্য, ''অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' কথাটি 'অথর্বেদীয়' মাণ্ডুক্যোপনিষদের দ্বিতীয় শ্লোকের অন্তর্গত। 'অয়ম্' অর্থাৎ এই আত্মাই ''ব্রহ্ম''। ইহাই আমাদের আশ্রমের মহাবাক্য।

আম্নায় একটি সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ পবিত্র ঐতিহ্য, প্রথা বা রীতি এবং পরম্পরাগতভাবে পরবর্তী উত্তরাধিকারে এ বর্তায়।

আমরা যেমন আমাদের বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন বা মহালয়ার তর্পনের সময় আমাদের পরলোকগত পূর্বপুরুষদের নাম গোত্র ইত্যাদি উল্লেখ করে তাঁদের স্মরণ করে জল নিবেদন করি, যার উদ্দেশ্য আমাদের নিজেদের বংশ পরিচয় নিজেদের জ্ঞাত থাকা। ঠিক তেমনই আমরা যে গুরু বা যে আশ্রমের আশ্রিত তাঁর আধ্যাত্মিক পরম্পরাগত পরিচয়টাও আমাদের জেনে রাখা দরকার। তাই উপরের অংশের আলোচনা।

ভারতবর্ষের সুদূর দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে সুদ্রতীরে কেরল নামক প্রদেশের বর্তমানে যে অংশ কোচিন, সেখানে আলোয়াই নদীর তীরে নারিকেল, সুপারি, কদলিবৃক্ষ দিয়ে ঘেরা অতি সুন্দর কালাডি গ্রাম। সেই গ্রামের এক নিষ্ঠাবান নাম্বুদ্রি বা নামপুদ্রি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন শিবগুরু। তাঁর ইচ্ছা ছিল শাস্ত্র পঠন-পাঠন করে কাটিয়ে দেবেন সারাটি জীবন। কিন্তু তাঁর পিতা বিদ্যাধরের বিশেষ আগ্রহে গুরুগৃহ হতে সমাবর্তন শেষে প্রত্যাবর্তন করে তাঁকে গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করতে হয়। পাশের গ্রামের এক পণ্ডিতের কন্যা বিশিষ্টা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। শিবগুরু এবং দেবীরূপিনী বিশিষ্টা দেবী সামান্য দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত স্বল্প আয়ে সংসার চালিয়ে সর্বদা ঈশ্বরের আরাধানায় মগ্ন থাকতেন। প্রায় বার্ধক্যে উপনীত হবার সময় শিবগুরুর মনে হল," তাঁদেরতো কোনও সন্তান নেই। তাহলে পুন্নামক নরক হতে কে তাঁদের উদ্ধার করবেন?

ক্রমশঃ

অমৃতবাণী

কোন কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি আমার কাছে আসেন আর প্রশ্ন করেন 'স্বামীজী ঈশ্বর কোথায় আছেন আমাকে বলুন'। আমি বলি— ঈশ্বর আপনার হৃদয়েই আছেন। বহির্মুখী চিত্তবৃত্তিকে অন্তরমুখী করতে পারলেই নিজের হৃদয়কমলে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া যায়।

—শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ।

শ্রীশ্রী গুরুমহারাজজীর শ্রীচরণাশ্রিত শ্রী শঙ্কর ভৌমিক ও শ্রীমতী রুণা ভৌমিকের সৌজন্যে

সর্ব সাধনার সার কথা

শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায়

মানব জীবন বড়ই দুর্লভ। এই জীবনের উদ্দেশ্য সাধারণ জীবন যাপন করছি বলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নয়। মানব জীবনের মূল প্রশ্ন হলো... আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? আমার জীবনের উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত? পূর্ব সংখ্যায় 'আমি কে'? এই ব্যাপারে আলোচনা করেছি কিন্তু সেই আলোচনায় সম্যক্ দৃকপাত করা যায়নি। জীবনকে জানতে, আমাকে জানতে এবং এই নশ্বর জীবনের উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়ে যেভাবে তাকে খোঁজা হয়, সেটাই হল সাধনা। সাধনার পথ বহু ও বিচিত্র, নানা মতবাদ, নানা আচার এবং নানা উপচারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যা সকল সাধনার মূল উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধে সেই সারসত্যকে জানব ও বিশ্লেষণ করব।

সাধনা শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'সাধ' ধাতু থেকে— যার অর্থ উপলব্ধি করা, অর্জন করা। তাই সাধনার অর্থ দাঁড়ায়— একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আত্ম নিয়ম, কায়িক ও মানসিক শুদ্ধি প্রয়োজন। শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার পালন নয়— বরং চেতনার উত্তরণ, আত্ম অনুসন্ধান এবং পরমব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার মিলন। যে পথেই হোক— ভক্তি, যোগ, জ্ঞান বা তন্ত্র— সকল পথের শেষ লক্ষ্য এক; ঈশ্বরের সাক্ষাৎ, আত্মসিদ্ধি ও মোক্ষ। তাই বলা হয়, সর্বসাধনার একই লক্ষ্য— তা হলো নিজের সত্তাকে শনাক্ত করা এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা।

সাধনা মানে শুধু জপ তপ নয়, এটি হলো চেতনার ক্রমবিকাশ, কামনা বাসনা থেকে মুক্তি এবং মায়া বন্ধন ছিন্ন করে চিরন্তন সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া। পৃথিবীর সকল দর্শন ও ধর্ম ব্যবস্থায় সাধনার গুরুত্ব অপরিসীম। হিন্দু দর্শনে যেমন সাধনা জীবন মুক্তির প্রধান উপায়, তেমনি বৌদ্ধদের ধ্যান, মুসলমানদের নামাজ, খ্রীস্টানদের প্রার্থনাও একধরণের সাধনা।

ভক্তি সাধনার পথে ঈশ্বর লাভ সহজে করা যায়। একাগ্র চিত্তে ঈশ্বরের নাম স্মরণ, কীর্তন, পূজা ইত্যাদির মাধ্যমে ভগবানের প্রতি প্রেম প্রকাশ এই ভক্তি সাধনার মূল কথা। রামানন্দ, মীরাবাঈ, চৈতন্যমহাপ্রভু প্রভৃতি সাধকরা ভক্তিমার্গ পথে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

আবার যোগ সাধনার মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। এখানে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগই একমাত্র লক্ষ্য। ক্রিয়াযোগে কুলকুণ্ডলী যোগ প্রভৃতি এর অঙ্গ। যোগের মাধ্যমে মনকে সংযত করে আত্মজ্ঞান লাভই প্রধান উদ্দেশ্য।

আবার জ্ঞান সাধনার কথা গীতায় বলা হয়েছে। জ্ঞান সাধনা আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আমি কে, আত্মা কী, সত্য কী- এসকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আত্মজ্ঞানে প্রবিষ্ট হওয়াই জ্ঞান সাধনার লক্ষ্য। আদি শঙ্করাচার্য্যের মতে, "ব্রহ্ম সত্য জগৎমিথ্যা"। এই বোধেই মুক্তির বীজ নিহিত।

আবার তন্ত্র সাধনার মানে শক্তির উপাসনা এবং নির্দিষ্ট মন্ত্র, বীজ মন্ত্র, মুদ্রা, ধ্যান যজ্ঞের মাধ্যমে

জীবের কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে সব চক্রসমূহ পার হয়ে চেতনাকে মহাশূন্যে লীন করা। এটি একটি গুপ্ত ও গম্ভীর সাধনা। এই পথে বহু বিপদ ও পরীক্ষা আছে তবে অনেকে মনে করেন এটি দ্রুততম সিদ্ধি পথ।

যে পথই হোক না কেন, সমস্ত সাধনার নির্যাস চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সেগুলি হল—

শ্রদ্ধা: গুরু ও ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি।

নিষ্ঠা: সাধনার প্রতি অটল মনোযোগ ও প্রতিদিন অভ্যাস।

বৈরাগ্য: সংসারের মায়া ও আকর্ষণ থেকে মনকে মুক্ত রাখা।

আত্মজ্ঞান: আমি কে?-এর উত্তর খোঁজা।

সাধনার আসল উদ্দেশ্যই হল নিজেকে জানা, ঈশ্বরকে জানা ও মোক্ষলাভ। হিন্দুদের বিশ্বাস মানবজীবন বারবার লাভ করা যায়।

সর্বসাধনার মূল কথা হল— নিজের সত্তাকে শুদ্ধ করা এবং আত্মাকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। যতক্ষণ 'আমি ও তুমি' বিভাজন আছে, ততক্ষণ সত্য উপলব্ধি হয় না। সাধনার মূল লক্ষ্য হলো এই দ্বৈত্যবোধ বিলীন করে অদ্বৈতের আনন্দে অবগাহন করা।

তাই উপনিষদ বলে— "তৎ ত্বম আসি"... তুই-ই আমি, আমিই তুই। "অহং ব্রহ্মাস্মি"— আমি সেই ব্রহ্ম। ভক্ত বলে, "তুমি ছাড়া আমি কিছুই নই", যোগী বলেন, "আমি ও ঈশ্বর একসূত্রে যুক্ত"। তান্ত্রিক বলেন, "শক্তিই শিব, আমি সেই শক্তির অংশ"। তাই এখানে লক্ষ্যণীয় যে ভিন্ন পথ হলেও লক্ষ্য কিন্তু এক।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "যত মত তত পথ, কিন্তু লক্ষ্য এক"।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "যদি তুমি নিজেকে ঈশ্বর বলে মনে কর, তবে তুমি মোক্ষপ্রাপ্ত হবে।" সাধনা মানে আত্মবিশ্বাস এবং নিজের অন্তরে ঈশ্বরকে জাগ্রত করা।

আজকের যুবসমাজের জন্য সাধনা একটি জরুরী বিষয়। এটা কিন্তু সন্ন্যাসীদের একচেটিয়া অধিকার নয়, প্রতিটি মানুষই নিজের আত্মোন্নতি করতে পারেন। মানুষ যে কোনও অবস্থাতে থেকেই নিয়মিত ধ্যান, নাম স্মরণ, পবিত্রতা, সততা এবং দয়া অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে উন্নত করতে পারেন, তার জন্য চাই সদিচ্ছা।

সর্বসাধনার তাই মূল কথা এই যে, "সত্যকে জানো, নিজেকে জানো এবং নিজের ভিতরে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করো।" এই উপলব্ধিই একমাত্র পরিত্রাণ, শান্তি ও আনন্দের উৎস। বিনা সাধনায় ঈশ্বরলাভ হয় না আর তাঁকে পেলে আর কিছু চাইবারও থাকে না।

তথ্যসূত্র:

১। উপনিষদ ও ভগবদ্গীতা

২। রামকৃষ্ণ কথামৃত

৩। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী

৪। তন্ত্রসাধনা প্রসঙ্গ-শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী স্মৃতিগ্রন্থ।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি

এস মাগো (পুনর্মূদ্রিত)

শ্রীফকির চন্দ্র শুকুল

জননি দুর্গে! দুর্গতি হরা—
তুমি মা জগদ্ধাত্রী,
অয়ি অন্নদে মঙ্গলময়ি!
চির বরাভয় দাতৃ।
জননি, তোমার বন্দন ভুলি'
শুধু হাহাকার, ক্রন্দন তুলি,
মোহ-অঞ্জন নয়নে লাগানো
সংসার পথ যাত্রী,
মায়ার বাঁধনে কলুষ-কলাপে
ঘনাইছে অমারাত্রি।

দেবী চণ্ডিকা রুদ্রাণীরূপে
তুমি মা সিংহবাহিনী
অসুর নিধনে দশায়ুধ করে
এসেছিলে, শুনি কাহিনী।
এখন তেমনি রয়েছে অসুর
মানুষের মাঝে চলেছে পশুর
হিংস্রবৃত্তি আচরণ মাগো—
এমন জীবন চাহিনি,
দীনতা ঘুচায়ে স্ব-ভাবে জাগাতে
এস মাগো উৎসাহিনী।

জননি তোমার আগমনী সুর
গুঞ্জরে সমীরণে,
আলোর জোয়ারে ভাসে চারিদিকে
হিল্লোল কাশ বনে।
'উমা' হ'য়ে এস, আদরে ভরাও—
'শ্যামা' রূপে মাগো আঁধারে সরাও,
দীপালীর আলো হোক মা সহায়
চেতনার জাগরণে
সকল কর্মে, মর্মে যেন মা—
ছোঁয়া পাই এ-জীবনে।

সম্পাদকীয়

মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী রূপ

বিভিন্ন সময়কালের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মানুষের জীবনধারা অঙ্গাঙ্গীণ ভাবে জড়িত থাকার প্রমাণ সেই প্রাচীনকাল থেকেই পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। যুগে যুগে সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এইসকল প্রেক্ষাপটেরও পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে আজ আমরা এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি।

রাষ্ট্রের প্রশাসক-পরিচালকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ সূত্র বলে প্রায় কিছুই ছিলনা। তার উপর ইসলামি ধর্ম ও সংস্কৃতির আধিপত্য (আনু. ১১৮৫-১২০৬ খ্রীঃ) এই সময়ে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় যথেষ্ট অধিপত্য বিস্তার লাভ করতে শুরু করায় বাংলার শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিতগণ তাঁদের ধর্মীয় সংক্রান্ত কঠোর বিধি নিষেধকে কিছুটা শিথিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই সময়ে লৌকিক দেবদেবীদের যথাযথ মান্যতা দেওয়া শুরু হয়। 'মঙ্গলকাব্য' নামে বিশেষ কাব্যধারার প্রচলন হয়। মনসা, ধর্ম, চণ্ডী শিব এক একটি ধর্মমত মানুষের মনে আবেগ আনয়ণ করে। এই সকল গাথা গান, অভিনয়, সুরকরে পাঁচালীর মত পাঠের দ্বারা মানুষের মনে রসবোধ জাগায় বলতে গেলে নতুন ধর্মের প্রচারের প্রসারতা বাড়ায়।

এই মঙ্গলকাব্যধারার মধ্যে 'চণ্ডীমঙ্গল' যথেষ্ট জনসমাদর লাভ করেছিল। বিভিন্ন তন্ত্রসম্বলিত গ্রন্থে শক্তিদেবী চণ্ডী-দুর্গার বিভিন্ন রূপের বর্ণনা আছে এবং পূজাপদ্ধতিরও কিছু ভেদাভেদ আছে।

বাংলায় দশভূজা দুর্গা-মহিষমর্দিনী পূজাই বিশেষ পূজা কমপক্ষে আট-নয়শত বছরের প্রাচীন।

আমাদের গুরুমহারাজ দেওঘর আশ্রমে যাগ-যজ্ঞাদি সহকারে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রকটকালে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে মহাসমারোহে পূজা আরতি কুমারীপুজো পূর্ণাহুতি সকলই সমাপন করতেন। প্রতিদিন আশ্রমে ভাণ্ডারা ইত্যাদি চলত, বহু শিষ্য-ভক্তের সমাগমে আশ্রমে তিল ধারণের জায়গা থাকত না। সে এক মহামিলন ক্ষেত্র তৈরি হত।

সেইসব ভক্ত-শিষ্যরা অনেকেই আজ আর ইহজগতে নেই অথবা শারীরিক অক্ষমতায় উপস্থিত হতে পারেন না, আজও গুরুমহারাজের কর্মধারা অনুযায়ী আমাদের ব্রহ্মচারী ভাইরা সকল আশ্রমে সেই ধারা পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বজায় রেখে চলছেন। অবশ্য অনেকেই নতুন নতুন ভক্তশিষ্যের আগমনে আশ্রম সেই আগের মতই মুখরিত হয়ে ওঠে। সকলের পুজোর আনন্দ সার্থক হোক শ্রীশ্রীগুরুচরণে এই প্রার্থনা।

জয়গুরু